মধ্যযুগের
ভারতীয় সাধক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
ও
বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোং
১০৫, কটন ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১০৫, কটন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০
মূল্য : এক টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ন্যাশন্যাল লিটারেচার প্রেস
১০৬, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কয়টি প্রবন্ধ এই পুস্তকখানিতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইল, সেগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলিতে মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক-সাধিকাদের বাণী ও জীবনী এমন সরল সুললিত ভাষায় আলোচিত হইয়াছে যে, আমাদের বিশ্বাস ইহা বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে সমাদৃত হইবে।

গ্রন্থখানিতে যাঁহাদের জীবনী ও বাণী আলোচিত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবন ছিল বড় সুন্দর—তাঁহাদের বাণীগুলি অমূল্য। আমাদের এই সংস্কার শাসিত সাম্প্রদায়িকতা-জীর্ণ দেশে জন্মিয়াও ঐ সকল মনীষী সকল প্রকার সংস্কারের জালজঞ্জাল আর সাম্প্রদায়িক-সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া ধর্ম্মের শাশ্বত সত্যরূপটি দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমাদের দেশের সকল প্রকার দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ এবং সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য, আমাদের মধ্যে একটা বিরাট সমন্বয় ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং আমাদের মনকে উদার সর্ব্বসংস্কারমুক্ত করার জন্য ইহারা আজন্ম সাধনা করিয়া গিয়াছেন। আজ আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সকল মনীষীর জীবনী ও বাণী উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে। যে-সাধনা ইহাদের ছিল, আমাদেরও সেই সাধনা করিয়া ভারতের কল্যাণের পথকে প্রশস্ত করার প্রয়োজন হইয়াছে। ইহাদের মন ও দৃষ্টি কত বড় ছিল, ইহাদের প্রাণের ভিতর কি আকাঙ্ক্ষা আগুনের মত জ্বলিতেছিল, কি সাধনা ইঁহাদের জীবনের সাধনা ছিল, আজ তাহা উপলব্ধির সময় আসিয়াছে বলিয়া আমরা এই গ্রন্থখানি আগ্রহের সহিত প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ যদি কিছু আনন্দলাভ করেন ও উপকৃত হন, তবে আমাদের সকল শ্রম সার্থক হইবে।

"হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে !"

মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক

কবীর

নানক

মীরাবাঈ

শ্রীচৈতন্য

রামপ্রসাদ

মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক

কবীর

ভারতের অস্পৃশ্যতা-সমস্যা দূর করিয়া ভারতবাসীর অন্তরে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য এদেশে যুগে যুগে বহু মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ সকল মনীষী ভারতবাসীর বুদ্ধির মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন—সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া ভারতবাসীর অন্তর যাহাতে উদার ও সর্ব্বসংস্কার-মুক্ত হইতে পারে সেজন্য তাঁহারা অমূল্য বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় একতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়া ভারতের কল্যাণের জন্য ইঁহারা সর্ব্বদাই অবহিত ছিলেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতকে ভক্ত-সাধক রামানুজ আচার্য্য দাক্ষিণাত্য প্রদেশে আবির্ভূত হন। তিনিই প্রথম শূদ্রকে বিষ্ণুভক্তি ও বিষ্ণুমন্ত্র লাভের অধিকারী বিবেচনা করেন এবং তিনিই ব্যবস্থা দেন যে শূদ্র ও ততোধিক পতিত অন্ত্যজ জাতির লোকেরাও 'পবিত্রা' বা পৈতা পরিতে পারিবে এবং অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতির লোকেরা বৎসরে একদিন দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবদর্শন করিবার অধিকার পাইবে। কিন্তু রামানুজ আচার্য্য মতে ও বিচারে কিঞ্চিৎ উদার হইলেও নিজে আচারে অত্যন্ত কঠোর

সাবধানী ছিলেন। অন্ত্যজ জাতিদের অস্পৃশ্যতা দূর করিবার কোনো চেষ্টাই তিনি করেন নাই।

এই সম্প্রদায়ের চতুর্থ (কারো মতে ৫ম-৬ষ্ঠ) গুরু হন রামানন্দ। ১৪০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে প্রয়াগে দ্রবিড়ী ব্রাহ্মণবংশে রামানন্দের জন্ম হয়। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল রামদত্ত; গুরুদত্ত নাম রামানন্দ। তিনি এমন মেধাবী ছিলেন যে ১২ বৎসর বয়সেই তিনি কাশীতে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যান এবং অল্প বয়সেই বহু বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য দেশ-ভ্রমণে যাত্রা করেন। বহু তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া ও বহু জাতির রীতিনীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার চিত্ত উদার ও কুসংস্কারমুক্ত হয়। কিন্তু তিনি কাশীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে আচারী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন, কারণ নানা দেশ পর্য্যটনের সময় রামানন্দ নিশ্চয় ব্রাহ্মণের সমস্ত কঠোর আচার পালন করিতে পারেন নাই। দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা যখন আহার করেন, তখন যদি কোন শূদ্র দূর হইতে সেই আহার দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাঁহাদের পাতিত্য ঘটে। রামানন্দ নিশ্চয়ই আপনাকে শূদ্রের দৃষ্টি-দোষ হইতে এবং শূদ্রের ম্লেচ্ছের স্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া তীর্থপর্য্যটন করিতে পারেন নাই। অতএব আচারী ব্রাহ্মণেরা বলিলেন যে, তাঁহার পাতিত্য ঘটিয়াছে এবং প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে আহার-ব্যবহার করিবেন না। রামানন্দ এই গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকার করিলেন

এবং আচারীদের সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া নিজে স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন। অন্ধ সংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে হিন্দুদের মধ্যে বোধ হয় এই প্রথম বিদ্রোহ।

রামানন্দ প্রচার করিলেন—যে-কোনো জাতির বা ব্যবসায়ের লোক হোক না কেন, সে যদি বিষ্ণুনামের ভক্ত হয়, তবে সে পবিত্র এবং এইরূপ সকল জাতির সাধুচরিত্র ভক্ত একত্র আহার করিতে পারেন। সে-কালে ইহা একটা অতি দুঃসাহসিক মত প্রচার। তিনি এইরূপে জাতিভেদের বৃহৎ মহীরুহের মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করিলেন। অস্পৃশ্যতা দূর করিবার যে চেষ্টা আজ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রথম প্রচারক ও অগ্রণী গুরু রামানন্দ। তিনি জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে সকলকে শিষ্য করিয়া প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন যে, ভগবদ্ভক্তি ও সাধু-চরিত্রই মানুষের মর্য্যাদার সামগ্রী, কোনো বিশেষ বংশে জন্ম মানুষের মর্য্যাদার সামগ্রী নয়। গুরু রামানন্দই সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মতত্ত্ব দেশ-প্রচলিত কথ্য ভাষায় প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে এক বৌদ্ধেরা ছাড়া আর কেহই সংস্কৃত ছাড়িয়া দেশী ভাষায় ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সাহস করেন নাই। গুরু রামানন্দই ইহার প্রথম পথ-প্রদর্শক। তিনি দক্ষিণী হইয়াও উত্তরাপথবাসী হইয়াছিলেন। তাই তিনি সেই দেশের কথ্য ভাষা হিন্দীতেই তাঁহার ধর্ম্মমত ও উপদেশ প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যগণও গুরুপ্রদর্শিত এই পথ অবলম্বন করিয়া নিজের নিজের দেশভাষাকে সমৃদ্ধ ও পবিত্র করিয়া গিয়াছেন।

রামানন্দের ৭২ জন শিষ্যের মধ্যে ৫৬ জন হীন জাতির লোক। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বারো জন; সেই বারো জনের মধ্যে কয়েকজন নিজের নিজের সম্প্রদায় গঠন করিয়া বিশেষ বিখ্যাত হইয়া আছেন—পিপা (গঙ্গারণ-গড়ের রাজপুত রাজা, জন্ম ১৪২৫ সালে। রাজ্য ত্যাগ করিয়া ইনি রামানন্দের শিষ্য হন), ধনা (জাতিতে জাঠ চাষা), রইদাস (বা রবিদাস, ১৭০০-১৪৫০ ? জাতিতে চামার), সেন (জাতিতে নাপিত), পদ্মাবতী (স্ত্রীলোক), ক্ষেমশ্রী (গোপকন্যা) এবং কবীর (জাতিতে জোলা বা মুসলমান তাঁতি)।

গুরু রামানন্দ তাঁহার শিষ্যদের নাম রাখিয়াছিলেন অবধূত, অর্থাৎ সংস্কার-মুক্ত। গুরু রামানন্দ বাস্তবিক গুরু নামের যোগ্য। তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা পতিত-পাবন ছিলেন এবং তাহার নীচ-জাতীয় শিষ্যগণ নিজেদের জ্ঞান ভক্তি ও চরিত্রের দ্বারা ভারতবর্ষকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। গুরু রামানন্দই ভারতে জাতীয় একতার মূল ভিত্তি স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইয়াছেন কবীর।

কবীরের জন্ম সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী আছে। তন্মধ্যে বহু-প্রচলিত জনশ্রুতি এই—কবীর কাশীর এক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার পুত্র। ব্রাহ্মণকন্যা আপনার সদ্যজাত পুত্রকে কাশীর লহরতলাব নামক পুষ্করিণীতে একটি পদ্মপাতায় শোয়াইয়া ভাসাইয়া দেন।

প্রভাতে নিমা নাম্নী একটি জোলা জাতিয়া স্ত্রীলোক ও তাহার স্বামী নিরু বা নুর আলী ঐ স্থান দিয়া বিবাহের নিমন্ত্রণে যাইতেছিল। নিমা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ঐ সরোবরে জলপান করিতে গিয়া দেখিল, কমলপত্রে এক সদ্যজাত শিশু ভাসিতেছে। শিশুর "সুন্দর সুরত মোহন মূরত কমল-নৈন" (সুন্দর শ্রী মোহন মূর্ত্তি ও কমল-নয়ন) দেখিয়া মুগ্ধ ও স্নেহার্দ্র হইয়া নিঃসন্তান নিমা ঐ শিশুকে তুলিয়া লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কবীরের জন্মসময় সম্বন্ধে কবীরপন্থীদের মধ্যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, ১৪৫৫ সংবতে (১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে সোমবারে পূর্ণিমা তিথিতে মেঘ ডাকিতেছিল, বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল, বৃষ্টি পড়িতেছিল, ঝড় হইতেছিল। এমন সময়ে লহর-পুষ্করিণীর জলে প্রফুল্ল কমলের মধ্যে কবীর-ভানু প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

তখন—

কমল কমোদিনী অনন্ত খিলে
তাঁহা করুণাময় করতার মিলে।
কলী কলী অনন্ত অলি
গুঞ্জিত গুঞ্জিত থকিত ভয়ে।
মোর মরাল চকোর সব
আব তালাবকো ঘের লয়ে॥

যে সরোবরে করুণাময় কর্ত্তা কবীরকে পাওয়া গিয়াছিল, সেই সরোবরে অসংখ্য কমল কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। অসংখ্য অলি কলধ্বনি ও গুঞ্জন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। ময়ূর, মরাল, চকোর, প্রভৃতি আসিয়া ঐ সরোবরকে ঘিরিয়া বিরাজ করিতেছিল।

জোলা-দম্পতী শিশুকে গৃহে আনিয়া নিজেদের পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শিশুর নামকরণের জন্য একজন কাজীকে ডাকিয়া আনিলেন। কাজী আসিয়া কোরান্ খুলিতেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল 'কবীর' শব্দের উপর। শিশু সেই নামেই পরিচিত হইলেন।

'কবীর' আরবী শব্দ ; তাহার অর্থ—মহান্, বৃহৎ বা ব্রহ্ম, পরমেশ্বর।

কাশী হিন্দুপ্রধান স্থান। কবীরের পালক-পিতা নিরু সেখের প্রতিবাসী প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু। বালক কবীর হিন্দু বালকদের সঙ্গেই খেলা করিতেন। তাঁহার খেলা ছিল ভগবৎ-পূজন ও ভগবানের নাম-কীর্ত্তন এবং হিন্দু বালকদের সংসর্গে তিনি ভগবানের ভারতবর্ষীয় ভাষার নামই কীর্ত্তন করিতেন।

কবীর একদিন ভগবানের ভারতবর্ষীয় ভাষার নাম উচ্চারণ করিয়া খেলা করিতেছিলেন। তাহাতে মুকুন্দ নামক এক ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলে—"তুই জাতে জোলা, তোর এইসব হিন্দু নাম উচ্চারণে অধিকার নাই"।

এই ভৎর্সনার উত্তরে কবীর বলেন—

মেরী জিহ্বা বিষ্ণু, নৈনী নারায়ণ,
হিরদে বসৈ গোবিন্দা।
যমদ্বারে জব পুছি সবব রে
তব ক্যা কহিস মুকুন্দা ?

আমার জিহ্বায় বিষ্ণু, নয়নে নারায়ণ, হৃদয়ে গোবিন্দ বাস করিতেছেন। ওরে মুকুন্দ, তুই যখন যমদ্বারে যাইবি, আর তোর হিসাব তলব হইবে, তখন তুই কি করিবি ?

তুম ব্রাহ্মণ, ম্যায় কাশীকা জুলহা, বুঝো মেরা জ্ঞানা।
তুম নিত খোঁজত ভূপতি, বাকে হরি-সঙ্গ মেরে ধ্যানা॥

তুমি ব্রাহ্মণ, আমি কাশীর জোলা, তুমি আমার জ্ঞান বুঝে দেখ'। তুমি নিত্য রাজা-রাজড়ার খোঁজে ফেরো, আর আমার ধ্যান অনুক্ষণ হরি-সঙ্গে বিরাজ করে।

কবীর জাতে জোলা বলিয়া লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। তাহার উত্তরে কবীর বলিয়াছিলেন—

কবীর তেরে জাতকো সব কোই হাসনহার।
বলিহারী ওয়া জাতকো জো সিমরে সৃজনহার॥

ওরে কবীর, তোর জাতের জন্যে সবাই তোকে উপহাস করে। কিন্তু বলিহারী ঐ জাতের যাহা সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ করায়। কারণ, স্বয়ং ভগবান একজন মহাতাঁতী—

ধরণী আকাশ-কী কারগাহ বানায়ী।
চন্দ সুরজ দুই নাল চালায়ী॥

ধরণী ও আকাশকে কারখানা বানাইয়া তিনি চন্দ্রসূর্য্য দুই মাকু অনবরত চালাইতেছেন।

মাতার ভর্ৎসনায় বালক কবীর খেলা ছাড়িয়া জাত-ব্যবসা শিখিতে আরম্ভ করেন। নাভাজী-বিরচিত ভক্তমালে আছে—

মাতার ভর্ৎসনে সাধু জীবিকা-কারণ।
তাঁত বুনে হয় মাত্র দিন নির্বাহন॥
নাল যে চালায় দুই হাতে তালে তালে।
জয় রাম শ্রীরাঘোরাম সীতারাম বলে॥

কবীর ছিলেন অল্পে তুষ্ট, গৃহস্থ বৈরাগী। তিনি ভগবানকে বলিতেন—

প্রভু ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা॥
দো রোটী এক লেংঠি তেরে পাস মো পাওযা।
ভক্তি-ভাও দে, আরোগ নাম তেরে গাওয়া॥

প্রভু আমি তোমার ভৃত্য, তুমি আমার প্রভু। তোমার কাছ হইতে দুটি রুটি আর একটি লেংটি পাইলেই আমার যথেষ্ট; তারপর তুমি ভক্তিভাব দিয়া তোমার আরোগ্য নাম গাওয়াও।

কবীর প্রত্যহ একখানি মাত্র বস্ত্র বয়ন করিতেন এবং সেই বস্ত্র বিক্রয় করিয়া যাহা পাইতেন, তাহা হইতে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ রাখিয়া বাকী অর্থ দরিদ্র-সেবায় দান করিতেন। একদিন কবীর তাঁহার বোনা কাপড় হাতে লইয়া বিক্রয়ের জন্য বাজারে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময়ে এক

দরিদ্র আসিয়া সেই বস্ত্রখানি ভিক্ষা চাহিল। কবীর দান করিয়া রিক্ত হস্তে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ভগবান যে দরিদ্ররূপে মানুষের কাছে দয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরেন, কবীর ইহা ভালরূপেই জানিতেন। তাই তাঁহার এমনি ত্যাগ!

প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনীর সঙ্গে অনেক অলৌকিক কিম্বদন্তী জড়িত হইয়া যায়। কথিত আছে যে, কবীরের দানে তুষ্ট ভগবান নাকি কবীর-বেশে পূর্ব্বেই কবীরের গৃহে আবির্ভূত হইয়া বহু খাদ্যদ্রব্য কবীরের মাতার নিকট দিয়া গিয়াছিলেন। কবীর গৃহে আসিয়া সেই খাদ্যসম্ভার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যান। তারপর সমুদয় খাদ্যসামগ্রী দীন ও সাধুদের বিতরণ করিয়া দিলেন, কবীরের গৃহে সেদিন মহামহোৎসব হইল।

সাধনা ও প্রতিভার জোরে কবীরের যে দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল, সে দৃষ্টি ভক্ত মহাপুরুষ ছাড়া যে-সে পায় না। কবীর সহজ ভক্তি ও নির্ম্মুক্ত জ্ঞান লাভ করিলেও একজন সৎগুরু লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু গুরু হইবার উপযুক্ত কাহাকেও তিনি দেখেন না।

ঐসা কোই না মিলা রাম-ভজন-কা মিত।
তন মন সোঁপে মৃগ জ্যোঁ শুনৈ বধিক-কা গীত॥

এমন কাহাকেও পাইলাম না, যিনি রাম-ভজনার মিত্র হইতে পারেন। এমন কাহাকেও পাইলাম না যিনি ভগবানে তনু মন সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়াছেন, যেমন মৃগ মুগ্ধ হইয়া বধকারী ব্যাধের গীত শ্রবণ করে।

সারা সুয়া বহু মিলে, ঘায়ল মিলে না কোই।

শিষ্যের খাইয়া খাইয়া হৃষ্টপুষ্ট বহু লোক মিলে, কিন্তু ভগবৎ-প্রেমে আহত ব্যক্তি একজনও পাওয়া যায় না।

কবীর রামানন্দের খ্যাতি শুনিয়াছিলেন। তাই শেষ পর্য্যন্ত কবীর তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন—

প্রভো ঐসা কোই না মিলা হামকো দে উপদেশ।
ভব-সাগরমে বুড়্তা, কর গহি কঢ়ে কেশ॥

হে প্রভু, আমি এমন কাহাকেও পাইলাম না, যে আমাকে উপদেশ দিতে পারে। আমি ভবসাগরে ডুবিয়া মরিতেছি, দয়া করিয়া আমার কেশ আকর্ষণ করিয়া উদ্ধার করুন।

গুরু রামানন্দ কবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কহাঁতে তুম আইয়া, কৌন্ তুম্হারা ঠাম।
কৌন্ তুম্হারা জাতি হৈ, কৌন্ পুরুষ, কৌন্ ধাম॥

তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথায় তোমার আবাস, তোমার জাতি কি, তোমার কুল গোত্র প্রভৃতির পরিচয় কি?

তখন কবীর উত্তর দিলেন—

অমর লোকতে আইয়া সুখকে সাগর ঠাম।
জাতি হমারী অজাতি হৈ, অগম পুরুষ-কো নাম॥
জাতি হমারী আত্মা, প্রাণ হমারা নাম।
অলখ হমারা ইষ্ট হৈ, গগন হমারা গ্রাম॥

আমি অমর-লোক হইতে আসিয়াছি, সুখসাগরে আমার

নিবাস, জাতি আমার অজাতি অর্থাৎ আমি অজাত, আমার পিতৃপুরুষের নাম অগম্য ; জাতি আমার আত্মা, আমার নাম প্রাণ, অলক্ষ্য নিরঞ্জন আমার ইষ্টদেবতা, সমগ্র গগন (বিশ্ব-ভুবন) আমার গ্রাম।

প্রথম হি রূপ জোলাহা কীন্হা।
চারি বরণ মোহিঁ ন চীন্হা॥
রামানন্দ গুরু দীক্ষা দেহু।
গুরুপূজা কছু হমসেঁ লেহু॥

প্রথমে আমাকে জোলা-রূপে সৃজন করা হইয়াছিল। চারি বর্ণের কেউ আমাকে চিনিতে পারিল না। হে গুরু রামানন্দ, আমাকে দীক্ষা দাও এবং আমার নিকট থেকে কিছু গুরুপূজা গ্রহণ করো।—

জাতি-পাঁতি কুল কাপড়া য়েহ সোভা দিন চারি।
কহে কবীর সুনো হো রামানন্দ য়েউ রহে ঝকমারি॥
জাতি হমারী বাণী, কুল করতা উর মাহি।
কুটুম্ব হমারে সন্ত হ্যায়, কোই মুরখ সমঝত নাহি॥

জাতির পাঁতি, কুল, কাপড় প্রভৃতির শোভা দু'চার দিন মাত্র থাকে। কবীর বলেন, শুনো হে রামানন্দ, এ সকল কেবল ঝকমারি। আমার বচনই আমার জাতি, অন্তর্য্যামীই আমার কুল, সাধু ব্যক্তি আমার কুটুম্ব। কিন্তু কোনো মূর্খই এই কথা বুঝিতে পারে না।

জাতি জাতিকে পাছনে, জাতি জাতিকে জায়।
সাহব জাতি সুজাতি হ্যায়, সব ঘট রহো সমায়॥

প্রত্যেক জাতির গৃহে যিনি অতিথি, যিনি সকল জাতির সঙ্গে একত্র বাস করেন, যিনি সকল দেহে প্রবেশ করিয়া থাকেন, সেই ভগবানের জাতি যদি সুজাতি হয়, তবে আমার বেলাই এত জাতের খবর নেওয়া কেন?

তখন রামানন্দ "আলিঙ্গন কৈল তাঁরে হৃদয়ে ধরিয়া" এবং বলিলেন—"তুমি তো যবন নহ, বিপ্র হইতে শ্রেষ্ঠ" এবং "শুদ্ধ জানি' বৈষ্ণবের পঙ্গতে লইল"। (ভক্তমাল)

ব্রাহ্মণ রামানন্দ স্বচ্ছন্দে মুসলমানকে শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু একথা মানিয়া লইতে ছুৎমার্গী জাতওয়ালা-দের মনে লাগে। তাই তাহারা গল্প রচনা করিয়াছে যে, রামানন্দ কবীরকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে অস্বীকার করেন। কবীর কিন্তু গভীর রাত্রে রামানন্দের বাড়ীর দরজায় গিয়া শুইয়া রহিলেন এবং প্রত্যূষে রামানন্দ গঙ্গাস্নানে যাইবার জন্য বাহিরে পা দিতে গিয়া কবীরের গায়ে পদার্পণ করেন। অজ্ঞাতসারে একজন লোকের গায়ে পা দিয়া সঙ্কোচে রামানন্দ বলিয়া উঠেন "রাম রাম!" এই গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক রাম-নাম উচ্চারণকেই কবীর নাকি রামানন্দের মন্ত্রদীক্ষা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন।

কবীর ভগবানকে রাম (আনন্দময়), প্রভু, সাঁই (স্বামী), আল্লা, খোদা (স্বধা বা আত্মপ্রতিষ্ঠ), পুরা সাহব (অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম), অনগঢ়িয়া দেবা (অগঠিত বা স্বয়ম্ভু দেবতা), প্রভৃতি

নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি নাম-রূপের অতীত সকল নাম-রূপ তাঁহারই একথা কবীর বুঝিয়াছিলেন।

কবীর বলিয়াছেন—আমার রাম দশরথের পুত্র নহেন, আমার হরি দৈবকীর পুত্র নহেন। পরমেশ্বর মানুষের এই সব কল্পিত ব্যক্তির চেয়েও মহান্‌, হিন্দু বা মুসলমানের ধারণার চেয়েও বৃহৎ। পরমেশ্বর অবর্ণ, তাই বর্ণমালার যে কোনো বর্ণযোজনায় যে শব্দ সৃষ্টি করিয়া মানুষ তাঁহাকে ডাকে, তাহাতেই তিনি সাড়া দেন।

কবীর বারম্বার বলিয়াছেন—

অলখ ইলাহী এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।
রাম রহীমা এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয।
কৃষ্ণ করীমা এক হ্যায়, নাম ধরায়া দোয়।
কাশী কাবা এক হ্যায়, একৈ রাম রহীম।
ময়দা এক, পকবন বহু, বৈঠি কবীরা জীম॥

অলখ ইলাহী, রাম রহীম, কৃষ্ণ করীম, কাশী কাবা, সব এক,—একেরই দুই নাম। যেমন ময়দা এক, কিন্তু ময়দা দিয়া বহু পক্কান্ন প্রস্তুত করা হয়, তেমনি। এই কথা জানিয়া কবীর স্থির হইয়া বসিয়াছেন।

মহাত্মা কবীর হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে বলিতেছেন—

ভাই রে, জগদীশ কহাঁতে আয়ে,
কহু কৌনে ভরমায়া ?
আল্লা রাম করীম কেশব
হরি হজরত নাম ধরায়া॥

গহনা এক কনক-তে
গহনা তামে ভাব ন দুজা।
কহন শুনন-কো দুই করি থাপে
এক নমাজ এক পূজা॥

ভাই রে, দুই জগদীশ্বর কোথা হইতে আসিলেন? বলো দেখি, এমন ভ্রমে তোমাদের কে ফেলিল? আল্লা রাম করীম কেশব হরি হজরত একেরই নাম-ভেদ মাত্র। এক সোনা দিয়া বিবিধ গহনা প্রস্তুত হয়, তাহাতে তো সোনার দ্বিত্ব বা বহুত্ব হয় না। বিভিন্ন ভাষার কথা বলা আর শোনা হইতেই এই দ্বিত্ব বা বহুত্বের স্থাপনা হয়; সেইরূপ নমাজ ও পূজা একই ভগবানের দেশ-ভেদে বিভিন্ন উপাসনার পদ্ধতি।

ওয়াহী মহাদেব ওয়াহী মহম্মদ ব্রহ্মা আদম কহিয়ে।
কোই হিন্দু কোই তুরক কহাবে এক জিমী পর রহিয়ে॥

তিনিই মহাদেব মহম্মদ ব্রহ্মা আদম। এক ভগবানের রাজ্য এক জমির উপর বাস করিয়া একই মানব-জাতির মধ্যে কেহ আপনাকে বলে হিন্দু, কেহ বলে তুর্কী অর্থাৎ মুসলমান।

নাম অনন্ত জো ব্রহ্মকা, তিনকা বার ন পার।
মন মানে সো লীজিয়ে, কহৈ কবীর বিচার॥

যে পরব্রহ্মের নাম অনন্ত, তাঁহার সীমা চিহ্ন তো কিছু নাই। যে নামটি তোমার মনে ভালো লাগে, সেই নামটি তুমি গ্রহণ করো, কবীর বিচার করিয়া এই কথাই বলেন।

বেদ কেতাব পঢ়ৈ, ওহে খুতওয়া
ওয়ে মোলানা ওয়ে পাড়ে।
বিগত বিগত কৈ নাম ধরায়ো
এক মাটীকে ভাঁডে॥

যিনি বেদ পড়েন তিনি হন পণ্ডিত, আর যিনি কেতাব কোরান খুতব (শুক্রবারের প্রার্থনা) পড়েন তিনি হন মৌলানা; এক মাটিরই ভাঁড়, ভিন্ন ভিন্ন নাম।

কবীরের মতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ভ্রমে পড়িয়াছে, ভুল পথে ধর্ম্মাচরণ করিতেছে, তাই তাহাদের কেহই আনন্দময়কে পায় না, চিরজীবন বিবাদে জন্ম কাটায়।

গুপ্ত প্রগট হৈ একৈ মুদ্রা।
কাকো কহিয়ে ব্রাহ্মণ শুদ্রা?
ঝূঠ গর্ব ভূলো মতি কোঈ।
হিন্দু তুরুক ঝূঠ কুল হোঈ॥

গুপ্ত ও প্রকট উভয়ের একই ছাপ। তবে কাহাকে বলি ব্রাহ্মণ, আর কাহাকে বলি শূদ্র? মিথ্যা গর্ব্বে কেহ ভুলিয়ো না। হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়-ভেদ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কবীর পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী অন্তর্য্যামী বলিয়া জানিয়াছিলেন—

পূরব দিশা হরিকো বাসা, পশ্চিম অলহ মুকামা?
দিল্‌মেঁ খোজি দিল্‌হিমা খোজো, ইহৈ করীমা রামা॥

পূর্ব্বদিকে হরির বাস, পশ্চিম দিকে আল্লার দেশ? হৃদয়ে খোঁজ' অন্তরে দেখো, এখানেই করীম বা রাম বিরাজ করিতেছেন।

যো খোদা মস্‌জিদ্‌মে বসতু হ্যায়,
আউর মুলুক কেহি কেরা ?
তীরথ মূরত রাম-নিবাসী,
বাহর করে কো হেরা ?

যদি খোদা কেবল মস্‌জিদেই বাস করেন, তবে অন্য দেশ-গুলো কার ? তীর্থের মধ্যে ও মূর্ত্তির মধ্যেই যদি কেবল আনন্দময় বাস করেন তবে বাহিরটাকে দেখে কে ?

পূরব পশ্চিম দেখ' দক্‌খিন উত্তর রহৈ ঠহরায়কে।
জহাঁ দেখো অগম্য গুরুকী তহী তত্ত্ব সমায়কে ॥

পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর ঠাহর করিয়া দেখো; যেখানে দেখিবে, সেখানেই সেই অগম্য গুরুর তত্ত্ব পরিপূর্ণ ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া আছে বুঝিতে পারিবে।

যেতে আউরত মর্দ্দ উপানী, সো-সব রূপ তুম্‌হারা।
কবীর পোঙ্গরা আল্লা-রামকা সো গুরু পীর হমারা ॥

হে ভগবান, পৃথিবীতে যত নরনারী সৃষ্টি করিয়াছ, সে সকলই তোমারই রূপ। কবীর আল্লা-রামের পুত্র! তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর।

কবীর মূর্ত্তিপূজাকে নিন্দা করিতেন—

আতম মারি পাষাণ হিঁ পূজৈ উনমে কছু না জ্ঞানা ॥
পীতল পাথর পূজন লাগে তীরথ গর্ব্ব ভুলানা ॥
হিন্দু কহৈ মোহি রাম পিয়ারা, তুরক কহৈ রহিমানা।
আপসমে দোউ লড়ি লড়ি মূয়ে, মর্ম্ম ন কাহু জানা ॥

আত্মাকে বিনাশ করিয়া যাহারা পাষাণ পূজা করে, তাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। কেহ পীতল ও পাথর পূজা করে ও তীর্থদর্শনের গর্ব্বে সত্যকে ভুলিয়া থাকে। হিন্দু বলে যে, 'রাম আমার প্রিয়, মুসলমান বলে 'রহমান'। এইরূপে দুজনে বিবাদ করিয়া মরে, কেহ ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম জানিতে পারে না।

কবীর বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলিকে বিভিন্ন বর্ণের গাভীর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সকল গাভীর দুধ যেমন একই প্রকার শুভ্র বর্ণের হয়, প্রকৃত ধর্ম্মও তেমনি একই প্রকার নির্ম্মল।

কবীর লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তিনি সহজ জ্ঞানের ও মুক্ত-বুদ্ধির বলে গভীর তত্ত্ব, শাশ্বত সত্য ও মধুর কবিত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কবীর নিজে বলিয়াছেন—

মসী কাগজ ত ছুঁয়ো নহি, কলম গহো নহি হাথ।
চারি যুগ মহাত্ম জেহি, কবিকৈ জানায়ো নাথ।

আমি কালী কাগজ ত কখনো ছুঁই নাই, কলম হাতে গ্রহণ করি নাই, হে নাথ, তবু তোমার চারিযুগের অর্থাৎ চিরকালের যে মাহাত্ম্য, তাহা তুমি কৃপা করিয়া আমাকে জানাইয়াছ।

লেখাপড়া না জানিলেও কবীরের মন ছিল উদার। তাঁহার মনের উদারতার পরিচয় তাঁহার প্রত্যেকটি গানে ও দোহায় আছে।

আধুনিক মতে অশিক্ষিত এই মহাজ্ঞানী ভক্ত কবি কবীর হিন্দী ভাষার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। কবীরের কথিত শাখী বা

উপদেশ ও শব্দ বা সঙ্গীত হিন্দীসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল রত্ন। ভারতের যে সকল প্রদেশের ভাষার সহিত অল্পাধিক পরিমাণেও হিন্দী ভাষার মিল আছে, সেই-সকল প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান সকলেই কবীরের বাণী ভক্তির সহিত এখনও পাঠ ও শ্রবণ করিয়া থাকেন।

সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্মের বাণী প্রচার করার পক্ষপাতী কবীর ছিলেন না। তিনি দেশী ভাষায় মত প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র রচনা ও দেশী ভাষায় শাস্ত্র রচনার তুলনায় সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন—

কবীরা সংস্কৃত কূপজল, ভাষা বহতা নীর।
জব চাহৌঁ তবহি ডুবৌঁ, শান্ত হোয় শরীর॥
বহতা পানী নির্ম্মলা, বন্ধা সো গন্ধা হোয়।

হে কবীর! সংস্কৃত কূপজল, ভাষা স্রোতের বহতা জল; যখন খুশী ডুব দিলেই শরীর স্নিগ্ধ হয়। বহতা জল হয় নির্ম্মল, আর বন্ধ জল হয় দুর্গন্ধ।

কবীর সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বাণী প্রচার না করিয়া দেশী ভাষায় সেগুলি প্রচার করায় উহা আপামর সাধারণ ব্যক্তির বোধগম্য হইয়াছে।

কবীর বরাবরই শাস্ত্র-গুরু পণ্ডিতের বাক্য ছাড়িয়া নিজের সহজ সদ্‌বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইবার উপদেশ দিয়াছেন।

পণ্ডিত আউর মসালচী দোনু সুঝে নাহি।
আউরন-কো করৈ চান্দনা, আপ আন্ধেরা মাহি॥

পণ্ডিত আর মশালধারী দুজনেই পথ দেখিতে পায় না। তাহারা অপরের পথ আলোকিত করে, কিন্তু নিজেরা অন্ধকারের মধ্যে থাকে।

কবীরের সময়ে হিন্দু মুসলমান পরস্পর প্রতিবেশী হওয়াতে পরস্পরের ধর্ম্মমতের প্রভাব পরস্পরের উপর পড়িতেছিল। কিন্তু মুসলমান তখন দেশের রাজা, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের ও গোঁড়ামির জোর রাজশক্তির সাহায্যে অত্যন্ত প্রবল। কাজেই সে সময়ে আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণ আপনাদের আচার ও সামাজিক বিধি দৃঢ়তর নিয়মে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এই অতি কঠোর নিয়মের গণ্ডীতে তদানীন্তন সমাজের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। এই সময় রামানন্দ ও তাহার শিষ্যগণ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করিয়া সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয় করিবার মহৎ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কবীর অন্যতম।

সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ অবস্থা সম্বন্ধে কবীর বলিয়াছেন—

> বেড়া দীন্হী খেতকো, বেড়া খেতহী খায়।
> তীন লোক সংশয় পড়ী, মৈঁ কাহি কহোঁ সমুঝায়॥

ক্ষেত রক্ষার জন্য ক্ষেতে বেড়া দেওয়া হইল, শেষে দেখি বেড়াই ক্ষেত খাইতেছে। তিন লোক সংশয়ে ডুবিয়া আছে, আমি এখন বুঝাই কাহাকে?—অর্থাৎ সামাজিক সংস্কার, আচার ও বিধি প্রভৃতি সমাজের মঙ্গলের জন্য হয়ত একদিন রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে সেই সংস্কার আর বিধি-নিষেধ

মানুষকে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহার উন্নতি ও মঙ্গলের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বহু সাধু ভক্তের জীবনের উপর কবীরের প্রভাব পড়িয়াছিল। আহমদাবাদের দাদূ কবীরের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এক কবীরপন্থীর শিষ্য হইয়াছিলেন। কাশীনিবাসী তুলসীদাসের উপরও তাঁর প্রভাব পড়িয়াছিল, কিন্তু তুলসীদাস কিছু হিন্দুভাবাপন্নই ছিলেন। কবীরের মিত্র ছিলেন ভক্ত সাধু রইদাস চামার। বৃন্দাবনবাসিনী মীরা বাঈ কবীরের ভক্তির কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গুরু নানক দেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়া কাশীতে আসিয়া কবীরের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করেন। শিখ 'গ্রন্থ সাহেব' কবীরের বাণীতে পূর্ণ। গুরু নানকের প্রচারিত শিখ ধর্ম্মকে কবীরের প্রচারিত ধর্ম্মের ছায়া ও শাখা বলা যাইতে পারে। ঐ দুই মহাপুরুষের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্ম-সমন্বয় ও উভয়কে একই ভূমিকায় মিলিত করা এবং একেশ্বরবাদ ও সর্ব্ব-মানবের একজাতিত্ব প্রচার। অযোধ্যার জগজীবন দাস কবীরের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সৎনামী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। মালব দেশের বাবালাল বাবালালী সম্প্রদায়, গাজীপুরের শিবনারায়ণ শিবনারায়ণী সম্প্রদায়, আলোয়ারের চরণদাস চরণদাসী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া কবীরের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের সকলের উপদেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-ধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছে দেখা যায়। এই-সব সাধু মহাত্মাদের

চেষ্টাতে উত্তর-ভারতের হিন্দু-মুসলমানের গোঁড়ামি ও অন্ধ কুসংস্কার যে কত কমিয়াছে, তাহা দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের সঙ্গে তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলমান এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে যেটুকু উদারতা দেখা যায়, তাহার মূলে রহিয়াছে কবীরের মহামূল্য বাণীর প্রভাব।

কবীর বুঝিয়াছিলেন ভারতবর্ষ কেবলমাত্র হিন্দুর বা মুসলমানের দেশ নয়। এই দুই প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মিলনের দ্বারাই ভারতবর্ষ সত্য ও শক্তি লাভ করিতে পারিবে। তাই তাঁতী কবীর তাঁতের উপমা দিয়া বলিয়াছেন—

তুরুক সূঈ, হিন্দু ধাগা, চিপড়া সিয়ৈ লাগি।
সিয়ৈ অংগিয়া সিয়ৈ চুন্দরী, ওঢ়ে জোগী রাগী॥
তুরুক তানা, হিন্দু বানা, কাপড়া বিনৈ লাগি।
বনে চুন্দরী বনৈ অংগিয়া, ওঢ়ৈ জোগী রাগী॥

মুসলমান সূচ, হিন্দু সুতা, পরমেশ্বর তাহা দিয়া কাপড় সেলাই করিতেছেন—সেলাই করিতেছেন, আঙিয়া আর রঙীন ফুলকাটা শাড়ী। অনুরক্ত ভক্ত সেই কাপড় পরিবেন বলিয়া। মুসলমান তাঁতের টানা আর হিন্দু পড়্যেন; তাহা দিয়া পরমেশ্বর কাপড় বুনিতেছেন—বুনিতেছেন তিনি রঙীন ফুলকাটা শাড়ী আঙিয়া যুক্তচিত্ত অনুরক্ত ভক্ত পরিবেন বলিয়া।

তুরুক তেল, হিন্দু ফলিতা, দিয়না বরনে লাগি।
বীচ মহলমৈ বরৈ আরতী বীবৈ সাহিব রাগী॥

মুসলমান তেল, হিন্দু পলিতা, তাহা দিয়া দীপ জ্বালা

হইয়াছে, মন্দিরের মধ্যে প্রেমিক প্রভুর আরতি চলিয়াছে, ইহাতেই সেই প্রভু তৃপ্ত।

তুরুক তুম্বী, হিন্দু তাঁতিয়া বীন্ বাজন লাগী।
সুরত নিরত বাজা বাজৈ রীঝৈ সাহব রাগী॥

মুসলমান হলো বীণার তুম্বী, আর হিন্দু হলো তার। এই বীণায় প্রেম ও বৈরাগ্যের পরিপূর্ণ সুর বাজিতেছে আর তাহারই সঙ্গীতে প্রেমিক স্বামীর হৃদয় জুড়াইতেছে।

উভয় ধর্ম্মের সমন্বয় করিতে গিয়া কবীর হিন্দু মুসলমান, উভয়কেই রূঢ় সত্য কথা শুনাইয়াছেন, ধর্ম্মের শাশ্বত দিকটি দেখাইয়া অনুষ্ঠানের ও সংস্কারের মূঢ়তা উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। ইহার ফলে হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মের গোঁড়া লোকেরা তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

কবীর অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণদের ও মুসলমানদের জীব বলি দেখিয়া উভয়কে তুল্য তিরস্কার করিয়াছেন।

মনকে নির্ম্মল পবিত্র ঈশ্বরপরায়ণ না করিয়া কেবল বাহ্য অনুষ্ঠান পালনকেও কবীর নিন্দা করিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ ভয়া তো ক্যা ভয়া, গলে লপটে সুত।
ভক্তি ভাবকা মরম ন জানে, য়্যায়সা জঙ্গলী ভূত॥

ব্রাহ্মণ হইল তো কি হইল? কেবল গলায় সুতাই লেপটাইল; ভক্তি-ভাবের মর্ম্ম সে জানে না, এমনি সে জঙ্গলী ভূত।

মালা ফেরত জনম গয়া, গয়া না মনকা ফের।
কর-কা মালা ছোড়কে মন-কা মনকা ফের॥

মালা ফিরাইতে ফিরাইতে তোমার জন্ম গেল। মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব তবু ঘুচিল না; এখন হাতের মালা ছাড়িয়া মনের মালা ফিরাও।

এইরূপে হিন্দু-ধর্ম্মের বাহিক অনুষ্ঠানের উপর যেমন তিনি আঘাত হানিয়াছেন, তেমনি মুসলমানদিগকেও তিনি শুনাইয়া গিয়াছেন—

কঙ্কর পাথর জোরিকৈ মস্‌জিদ লই চুনায়।
তা চঢ়ি মোল্লা বাগ দে, ক্যা বহিড়া হুয়া খোদায়?
কীড়ী কে পগ নেবর বাজে, সোভী সাহব সুনতা হৈ॥

কাঁকর পাথর চুন দিয়া জুড়িয়া মস্‌জিদ প্রস্তুত হয়, তাহার উপর চড়িয়া মোল্লা চীৎকার করিয়া আজান দেয়। (ইহার কি কোন প্রয়োজন আছে?) কেন, খোদা কি বধির হইয়াছেন? অতি ক্ষুদ্র কীটের চরণেও যে নূপুর বাজে তাহাও সেই প্রভু শুনিতে পান।

কবীর প্রতিমা-পূজা, কেবলমাত্র মন্দিরে বা মস্‌জিদে পূজা করা, বিশেষ বিশেষ তীর্থ-স্থানকে পবিত্র বা পুণ্যস্থল মনে করা, জাতি বা ধর্ম্মভেদে মানুষে মানুষে পৃথক বোধ করা প্রভৃতি সকল সংস্কারের বিরুদ্ধে সারা জীবন যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অথচ সব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে তিনি পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন। সকল ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার

শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু ধর্ম্মের—সে যে কোন ধর্ম্মই হউক না কেন,—বাহিরের আবর্জ্জনা ও সাম্প্রদায়িকতাকে বাদ দিয়া, উহার যাহা সার্ব্বজনীন সত্য তাহাকে তিনি অতি সহজেই বুঝিয়া লইয়াছেন এবং সেই অর্থহীন বাহিরের আবর্জ্জনার উপর তিনি প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ আঘাত হানিয়া তিনি চাহিয়াছেন—সকল ধর্ম্মের নির্ম্মল রূপটিকে দেখিতে—তিনি চাহিয়াছিলেন ভারতের ধর্ম্ম-সমস্যা মিটাইয়া সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে মিলনসূত্রে বাঁধিতে।

কবীরের আবির্ভাবকালে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু কবীর এই সকল ঝগড়ার উপরে উঠিয়া গিয়া সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, সব ধর্ম্মের মূল সত্য এক—অতএব সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব অর্থহীন এবং জাতির পক্ষে অকল্যাণকর।

কবীর বলিয়াছেন কোনো এক বিশেষ স্থানে বসিয়া উপাসনা করিলেই ভগবানকে পাওয়া যায় না।

মোকো কাহাঁ ঢুঁড়ো বন্দে, ম্যয় তো তেরে পাস মে।

ওরে বান্দা (আমার সেবক সাধক!) তুমি আমাকে কোথায় খুঁজিতেছ? আমি তো তোমার পাশেই তোমার সঙ্গে-সঙ্গেই আছি।

ন হোয়ে মো খাল রোম-মো, ন হাড্ডি ন মাস-মো।
ন দেবল-মো, মস্‌জিদ-মো, ন কাশী কৈলাস-মো॥

আমি চর্ম্মে বা চুলে দাড়িতে বাস করি না (অর্থাৎ গায়ে

তিলক ছাপ লাগাইলেই বা চুল দাড়ি রাখিলেই আমাকে পাওয়া যায় না), আমি অস্থি-মাংসের মধ্যেও বাস করি না। আমার বাস কেবল দেবালয়ে মসজিদে বা কাশী কৈলাসেও নয়।

ন হোয়ে ম্যয় আউধ দ্বারকা, মেরা ভেট বিশ্বাস-মো।
ন হোয়ে ম্যয় ক্রিয়া-করম-মো, ন যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস-মো॥

আমি কেবল অযোধ্যা দ্বারকাতেই বাস করি না। আমার সাক্ষাৎ মিলিবে দৃঢ় বিশ্বাসে। আমি ক্রিয়া অনুষ্ঠানে নাই, যোগ-বৈরাগ্য-সন্ন্যাসের বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যেও আমি নাই।

খোঁজেগা তো আও মেলুঙ্গা পল ভরকে তালাস-মো।
শহর-সে বাহর ডেরা হামারী, কুটিয়া মেরী মৌয়াস-মো।
কহত কবীরা সুনো ভাই সাধো, সব সন্তান-কী-সাথ-মো॥
সব স্বাঁসো-কী স্বাঁস-মো॥

হে সাধক, তুমি যদি আমাকে খোঁজো তাহা হইলে এক মিনিটের খোঁজের মধ্যে আমি আসিয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হইব। আমার বাস শহরের জন-কোলাহল ও দ্বন্দ্ববিরোধ অপবিত্রতার বাহিরে। আমার কুঠি প্রেমভক্তিযুক্ত উৎসুক জনের হৃদয়ে। কবীর বলিতেছেন, শুন ভাই সাধু, আমি আমার সন্তান স: জীবের সঙ্গে সর্ব্বদা বাস করি—সকল প্রাণীর শ্বাসের মধ্যে আমি আছি।

তীর্থ-ভ্রমণের ও প্রতিমা-পূজার অসারতা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

তীরথ-মে তো সব পানী হৈ,
হোবৈ নহী কছু ন্হায় দেখা।

প্রতিমা সকল তো জড় হৈ,
বোলে নহি বোলায় দেখা ॥

তীর্থ তো কেবল জল, আমি স্নান করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে কোনো ফল হয় না। প্রতিমা সকল তো জড় মাত্র, ডাকিয়া দেখিয়াছি উহারা ত সাড়া দেয় না!

কবীর মুসলমানদের তীর্থযাত্রার অনর্থকতাও প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, খোদা সর্ব্বগ বিভু সর্ব্বব্যাপী তাহাকে একটি বিশেষ স্থানে আবদ্ধ মনে করা মূর্খতা—

কবীর হজ কাবা হাম জায থা,
আগৈ মিলিয়া খোদায।
সাঁই মুঝ-সো লড় পড়ৈ—
তুঝৈ কিন্ ফরমাযী গায?

আমি কবীর, কাবায় হজ করিতে চলিয়াছিলাম। পথেই খোদার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। স্বামী আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিলেন—বলিলেন, তোমাকে কে তীর্থযাত্রা করিতে পরামর্শ দিলে?

মুসলমানেরা কবীরের ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বিব্রত ও ক্রুদ্ধ হইয়া একবার বাদশাহের কাছে নালিশ করিল। তখন দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন সিকন্দর শা লোদী (১৪৮৮-১৫১৭)। ১৪৯৫ সালে সিকন্দর শা কবীরকে গেরেপ্তার করাইয়া জৌনপুরে দরবারে হাজির করিলেন। কবীর সেখানে উপস্থিত হইলেন।

বাদশাহ কবীরকে প্রশ্ন করিলেন—তুমি হিন্দু না মুসলমান ?

কবীর উত্তর দিলেন—

হিন্দু কহুঁ তো ম্যায় নহী, মুসলমান ভী নহি।
পাঁচ তত্ত্বকা পুতলা গৈবী খেলে মাহিঁ॥

আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। পঞ্চভূতাত্মক পুত্তলিকা আমার মধ্যে অদৃশ্য রহস্যের খেলা চলিয়াছে।

হিন্দু ধ্যাবৈ দেহরা, মুসলমান হুঁ মসীত।
দাস কবীর তহাঁ ধ্যাবহী জহাঁ দোনকী পরতীত॥

হিন্দু মন্দিরে ঈশ্বরের ধ্যান করে, মুসলমান মসজিদে। দাস কবীর সেইখানে ধ্যান করে যেখানে দুই জনেরই প্রতীতি।

কবীরকে প্রশ্ন করা হইল তাঁহার বাড়ী কোথায় ? কবীর উত্তর দিলেন—

সুর নর মুনিজন আউলিয়া, ইয়ে সব বোলৈ তীর।
আল্লা-রামকী গম নহী, তাহাঁ ঘর কিয়া কবীর॥

সুর নর মুনি আউলিয়া যে মহাসমুদ্রের তীরে বসিয়া তত্ত্ব-বিচার করেন, যেখানে আল্লা বা রাম নামের গতি নাই, সেখানে কবীর ঘর করিয়াছেন।

জঁহ সে আয়ে অমর উয় দেশওয়া,
ন হুঁয়া ব্রাহ্মন শূদ্র ন সেখওয়া॥
ন হুঁয়া ব্রহ্মা ন আল্লা মহেসওয়া।
ন হুঁয়া জোগী জংগম দরবেশওয়া॥

কহৈঁ কবীর লৈ আয়ন সন্দেসওয়া।
সার স্বর গহো চলো ওহি দেসওয়া॥

আমি যে দেশ হইতে আসিয়াছি, সেই দেশ অমরধাম। সেখানে না আছে ব্রাহ্মণ, না আছে, শূদ্র, আর না আছে হিন্দু মুসলমান ভেদ। সেখানে ব্রহ্মাও নাই, আল্লাও নাই, মহেশও নাই, সেখানে যোগী সন্ন্যাসী দরবেশ ফকীর কিছু নাই। কবীর বলিতেছেন—আমি সেই দেশ হইতে এই বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছি। পূর্ণতার স্বুরে অবগাহন করিয়া, নির্ম্মল পবিত্রচিত্ত ক্ষুদ্রতামুক্ত হইয়া চলো সেই দেশে সকলে যাই।

বাদশার খোসামুদেরা কবীরকে বলিল—তুমি রাজার মুখের উপর এমন জবাব দাও, তোমার কি প্রাণের ভয় নাই?
কবীর বলিলেন—

কবীরা কাহাকো ডরে, শির পর সৃজনহার।
হস্তী চঢ়ী ডরিয়ে নহী, কুকুর ভুসে হাজার।

কবীর কেন কাহাকে ভয় করিবে? মাথার উপর রহিয়াছেন সৃষ্টিকর্ত্তা। যে লোক হাতীতে চড়িয়াছে, কুকুরে হাজার ভেউ ভেউ করিলেও তাহার আর কিসের ডর?

সিকন্দর লোদী শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। কাজেই তিনি কবীরকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

কবীর গৃহস্থ সন্ন্যাসী ছিলেন। পরগলগ্রহ হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়া, অথবা গায়ে ভস্ম মাখিয়া বা গেরুয়া প্রভৃতি

বিশেষ বেশ পরিয়া সন্ন্যাসী সাজাকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন। তিনি শিষ্যদের উপদেশ দিয়াছেন—

মাঙ্গন মরণ সমান হৈ, মত কোই মাঙ্গ ভিখ্।
মাঙ্গনা সে মরণা ভালা, ইহ সদ্‌গুরু-কী শীখ্।

ভিক্ষা মরণের সমান। কেহ ভিক্ষা চাহিয়ো না। ভিক্ষা করার চেয়ে মরণ ভালো। ইহাই সদ্‌গুরুর শিক্ষা।

সাধু ভিখ ন মাঙ্গই, যো মাঙ্গে সো ভাড়।

সাধু ব্যক্তি কখনো ভিক্ষা চায় না, যে চায় সে ভণ্ড।

নগর ছোড় জঙ্গল বসে ছুটত নহি জঞ্জাল।
মোকান ছোড় ক্যা হোতা? ইয়ে মন হৈ চণ্ডাল॥

নগর ছাড়িয়া জঙ্গলে বাস করিলেও জঞ্জাল ঘোচে না। দেহ-ত্যাগ করিয়া কি হয়? যেখানে যাও মন তো সঙ্গে যায়, এই মনই হইতেছে চণ্ডাল, অর্থাৎ সকল পাপের আগার।

ধর্ম্মলাভের জন্য অনেকে কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া থাকেন। কবীর কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধনের বিরোধী ছিলেন—

আঁখ ন মুদূ কান ন রুধুঁ, কায়াকষ্ট ন ধারুঁ।
খুলে নয়ন মৈঁ হঁস হঁস দেখুঁ সুন্দর রূপ নিহারুঁ॥

এই পরম সুন্দরের সুন্দর জগতে আমি আঁখিও মুদিব না কানও রুধিব না, কায়াকষ্টও করিব না; নয়ন খুলিয়া আমি কেবল হাসিয়া হাসিয়া দেখিব, সুন্দরের সুন্দর রূপ।

কবীরের স্ত্রীর নাম ছিল লোঈ। কবীরের এক পুত্র ও এক

কন্যা ছিলেন। যেদিন সন্ন্যাসী কবীরের প্রথম সন্তান লাভ হয়, সেদিন এক মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। কবীর সেদিন কাপড় বেচিয়া বাড়ী আসিতেছিলেন। সন্ন্যাসী কবীরের ছেলে হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্ত ব্রাহ্মণ মোল্লা সবাই হাটের পথে আগাইয়া গিয়া বিদ্রূপ করিয়া কবীরকে বলিল—কবীর, তোমার ছেলে হইয়াছে। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, কবীর এই সংবাদে হয়ত লজ্জা পাইবেন। কিন্তু কবীর ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রসন্ন মুখে এই সুন্দর বাণী উচ্চারণ করিলেন—

অনহদ মুসাফির পহুনা আয়া ধরৌ মঙ্গল থার।
ঘর আংগন-কী কদর ভঈ হৈ রাহ্ হৈব গুলজার॥

অসীম পথের পথিক (আজ আমার গৃহে) অতিথি হইয়া আসিয়াছেন, মঙ্গল-থালা ধরিয়া তাহাকে বরণ করি। আজ আমার ঘর ও অঙ্গনের আদর বাড়িল, আজ (আমার) পথ হলো ফুলের বাগানের মতন উজ্জ্বল শোভাময়।

কবীর তাঁহার পুত্রের নামকরণ করেন কমাল।

অতঃপর কবীরের নিন্দুকেরা প্রচার করিতে লাগিল—

ডুবা বংশ কবীরকা, জবহি উপজা পুত্র কমাল।

কবীরের পুত্র কমাল জন্মাল এবং কবীরের গুরুশিষ্য পরম্পরা সাধনার বংশধারা আজ হইতে লোপ পাইয়া গেল।

কিন্তু নিন্দুকদের এই আশঙ্কা সত্য হয় নাই। কমাল পিতার

সাধনার ধারা নিজের সাধুজীবনে বহন করিয়া উহাকে অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এখন ভারতে কবীরপন্থীদের সংখ্যা ৪০।৫০ হাজারের কম নয়।

কমালের পরে কবীরের একটি কন্যা জন্মে। কবীর তাঁহার নাম রাখেন কমালী।

কমালী একদিন কূপ হইতে জল আনিতে গিয়াছিলেন। তখন এক ব্রাহ্মণের জলের কলসীতে কমালীর হাতের জলের ছিটা লাগে। ব্রাহ্মণের কলসী ছুৎ হইয়া যায় এবং ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ গিয়া কবীরের কাছে নালিশ করে। কবীর সেই ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিলেন—

পণ্ডিত বুঝ পিয় তুম পানী।
তোহে ছুত কহাঁ লপটানী।
জা মাটীকে ঘরমে বৈঠে তামে সৃষ্টি সমানী॥

হে পণ্ডিত, তুমি বুঝিয়া-সুঝিয়া জল পান করিয়ো। এই জলে কোথা হইতে ছুত লাগিল ? যে মাটির ঘরে তুমি বাস করো সেই মাটির ঘরে সকল পৃথিবীর মাটির তো সংযোগ রহিয়াছে !

ছাপন কোটী যাদব জহঁ বিনশে, মুনিজন সহস আঠাসী।
পরগ পরগ পৈগম্বর গাড়ে, তে সডি মাটি মাসী॥

এই মাটিতে ছাপ্পান্ন কোটী যদুবংশীয় লোক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অষ্টাশি সহস্র মুনি। কত কত পয়গম্বর এই মাটিতে কবরে নিহিত হইয়াছেন, তাঁহারা পড়িয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন।

মৎস্য কচ্ছ ঘরিয়ার বিয়ানে রুধীর নীর জল ভরিয়া।
নদিয়া নীর নরক বহি আবৈ পশু মানুষ সব সড়িয়া॥

মাছ কচ্ছপ ঘড়িয়াল প্রভৃতি জলের মধ্যে প্রসব করিতেছে, জলে কত ক্লেদ রক্ত ভরিয়া থাকে। নদীর জলে নরক ভাসিয়া আসে, কত পশু মানুষ তাহাতে পচিয়া যাইতেছে!

তা মাটীকা ভাড়া ঘড়িয়া, তা মে ভরিয়া পানী।
সো পাঁড়ে তুম পানী পীয়া স্থগ কাহাতে আনী॥

সেই মাটিতে ভাঁড় আর ঘড়া গড়া হয়, সেই-সব পাত্রে জল ভরা হয়। হে পাঁড়ে, সেই জল তো তুমি পান করিয়াছ, অতএব এখন তোমার শোক কোথা হইতে আসিল!

কহৈ কবীর শুনহো পাঁড়ে, ছাড়ো মনকে ভর্মা।
বেদ কেতাব সব ইয়াহি ডারো, রহো রামকী শরণা॥

কবীর বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, শোনো, মনের ভ্রান্তি দূর করো, বেদ কোরান প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধান এই জলেই ফেলিয়া দাও, এবং সত্যস্বরূপ আনন্দময় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হও।

এইরূপে পণ্ডিত ও মোল্লা সকলকে তিরস্কার করিয়া তিনি উঁহাদিগকে দেশকালাতীত সত্য সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দেবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং দেশের সকল লোককে দেশকালের সংস্কার হইতে মুক্ত স্বাধীন নির্ম্মলা বুদ্ধিতে সব কিছুকে বিচার করিয়া দেখিতে বলিয়াছিলেন। কবীর অপক্ষপাতে হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় ধর্ম্মের ও সমাজের কুসংস্কার ও কুপ্রথাকে আক্রমণ ও তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া উভয় ধর্ম্মের লোকই

তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে কাশীতে বাস করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

কবীরের শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় সেকেন্দব লোদী কবীরকে শেষ পর্য্যন্ত কাশী হইতে নির্ব্বাসনের আদেশ দিয়াছিলেন। তখন কবীর কাশী ছাড়িয়া কিছুদিন ফতেপুর জেলায় গঙ্গা-তীরবর্ত্তী মাণিকপুরে অবস্থান করেন এবং তৎপরে প্রয়াগ বা এলাহাবাদের পরপারে ঝুসী নামক গ্রামে অবস্থান করেন। এইখানে তিনি শেখ তক্কী সুরবর্দ্দী প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ মুসলমান সুফী সাধুব সঙ্গলাভ করেন। শেখ তক্কীকে কবীর পীর বা গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ শেখ তক্কীর কাছে কবীর বর প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মিটাইয়া তাহাদিগকে সম্প্রীতিতে মিলাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু কবীরের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয় নাই। তাই তিনি বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

হিন্দু কহত হৈ রাম হমারা, মুসলমান রহিমানা।
আপস-মেঁ দোউ লড়ে মরত হৈ, মরম কোই নাহি জানা॥

হিন্দু বলে আমার রাম, মুসলমান বলে আমার রহিম; পরস্পর দুজনে লড়াই করিয়া মরিতেছে, কিন্তু আসল ধর্ম্মতত্ত্বটি কেহই বুঝিল না।

সারি দুনিয়া বিনসতী অপনী অপনী আগি।
ঐসা জিয়রা না মিলা জাসোঁ রহিয়ে লাগি॥

আপন আপন সম্প্রদায়ের কুসংস্কারের আগুনে সারা দুনিয়া বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। এমন প্রাণ একটা মিলিল না যাহার কাছে গিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াই।

কবীর প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার মত লোকের সন্ধানে তিব্বত আফগানিস্থান, তুর্কিস্থান, খোরাসান, বালখ্ বুখারা, ইরাণ প্রভৃতি বহু দূর-দূরান্তর দেশ পর্য্যটন করেন। অবশেষে গোরখপুরের নিকটে হিমালয়ের পাদমূলে মগহর গ্রামে গিয়া উপনীত হন এবং সেখানেই নির্জ্জনবাসে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করেন।

কাশীতে মরিলে শিব হয় বলিয়া লোকের যেমন ধারণা, তেমনি অন্ধবিশ্বাস আছে যে, ব্যাসকাশী ও মগহরে মানুষ মরিলে পর-জন্মে গাধা হয়। তাই কবীর কাশী ত্যাগ করিয়া মগহরে বাস করিবেন স্থির করিলে তাঁহার শত্রুরা যেমন খুশী হইয়াছিল, ভক্ত শিষ্যগণ তেমনি দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কবীর ভক্তদের এই কথা বলিয়া বুঝাইলেন যে—হাম্ মুফত্ মুক্তি নেহি লেঙ্গে—আমি বিনামূল্যে মুক্তি লইব না। ভগবানের সাধন-ভজন না করিয়া কেবল কাশীতে দেহত্যাগ করিয়া স্থানমাহাত্ম্যে মুক্তিলাভ আমি চাই না। যদি ভগবদ্‌ভক্তি থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়া আমি মগহর হইতেই মুক্তি আদায় করিয়া লইয়া তবে ছাড়িব। নিজের শক্তির উপর, সাধুপ্রকৃতির উপর এবং ভগবানের উপর কতখানি আস্থা থাকিলে তবে এমন কথা বলা যায়, একথা সহজেই অনুমেয়।

ক্যা কাশী ক্যা উসর মগহর হৃদয় রাম বস মোরা।
জো কাশী তন্‌ তজে কবীরা রামকো কোন্ নিহোরা!

মুক্তিক্ষেত্র কাশীই বা কি আর অনুর্ব্বর মগহরই বা কি? আমার হৃদয়ে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে আনন্দময় বিরাজ করেন। হে কবীর! কাশীতে দেহত্যাগেই যদি মুক্তি সুলভ হইত, তবে কে রামের অপেক্ষা রাখিত!

মগহরে গিয়া কবীর এই বাণী বলিয়াছিলেন—

য্যায়সা মগহর ত্যায়সা কাশী, হাম এক কর জানী।
হাম নিরধন, জিউ ইহ ধন পাইয়া, মরতে ফুট গুমানী॥

যেমন মগহর, তেমনই কাশী, আমি এক বলিয়াই জানি। আমি নির্ধন, এখানে আসিয়া ভক্তি ও শান্তি ধন পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম। কাশীবাসে মুক্তি তো হইবেই এই মিথ্যা গর্ব্বে আমি মারা যাইতাম!

মগহরে কিছুদিন বাস করিবার পর কবীরের দেহ অপটু হইয়া আসিয়াছিল। তখন তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার দেহের বিনাশ আসন্ন হইয়া আসিয়াছে।

শিষ্যগণ উদ্বিগ্ন হইলে কবীর বলিলেন—

কবীরা তো হরিপৈ চলা, মায়া-মোহ-সো তোরি।
গগন-মণ্ডল আসন কিয়া, কাল রহা মুখ মোরি॥

কবীর মায়া মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হরির অভিমুখে চলিয়াছে। অসীম আকাশ-মণ্ডলে তাহার আসন বিছানো

রহিয়াছে। মহাকাল কবীরকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে. আমি দেশকালাতীত হইতে চলিয়াছি।

হম্ বাসী উস্ দেশ-কো জহঁা জাতি বরণ কুল নাহি।
শব্দ মিলাবা হোয় রহা, দেহ মিলাবা নাহি॥

আমি সেই দেশের বাসিন্দা, যেখানে জাতি বর্ণ কুলের বিভেদ নাই। আমি এখন ভগবানের নামের সহিত মিলিত হইয়াছি, দেহের সহিত আমার আর এখন আর কোন সম্বন্ধ নাই।

কবীর জব হম্ গাবতে তব্ ব্রহ্ম জানা নাহি॥
অব ব্রহ্ম দিলমে দেখিয়া, গাবন-কুঁ কছু নাহি॥

আমি কবীর যখন গান করিতাম, তখন ব্রহ্মের তত্ত্ব কিছু জানি নাই। এখন ব্রহ্মকে হৃদয়ে দর্শন করিতেছি, এখন আর আমার গান করিবার কিছু নাই।

পুরে সো পরচা ভয়া, দুখ সুখ মেলা দূরি।
যমকী ফাঁসী কটি গই, সাঁই মিলা হজুরি॥

পূর্ণ যিনি তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছে, আমি দুঃখ-সুখের অতীত হইয়াছি, যমের ফাঁসি কাটিয়া গিয়াছে। স্বয়ং স্বামীর সঙ্গে আমার আজ মিলন ঘটিয়াছে।

কবীর অমি-নদীর তীরে পুষ্পশয্যায় শুইয়া শেষ গান গাহিয়াছিলেন আর নিজের শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া বিদেহ হইয়া যান। তারপর সেই দেহের সৎকার লইয়া হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ লাগিল। হিন্দুরা বলিল, কবীর ছিলেন হিন্দু, তাঁহার দেহ দাহ

করিতে হইবে। মুসলমানেরা বলিল—কবীর ছিলেন মুসলমান, তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিতে হইবে। কিম্বদন্তী আছে যে, কবীরের বস্ত্রাচ্ছাদন অপসারণ করিয়া দেখা যায় যে, কবীরের দেহ অন্তর্ধান করিয়াছে, কেবল কতকগুলি ফুল সেই স্থানটিতে পড়িয়া আছে। সেই ফুলের কতক হিন্দুগণ কাশীতে লইয়া গিয়া দাহ করিল। বর্ত্তমান কবীর-চৌরা নামক স্থানে কবীরের ভক্তগণ কর্ত্তৃক সেই ভস্ম সমাধিস্থ হইয়াছিল। বাকী ফুল মুসলমানেরা সেই মগহরেই কবর দিল। সেইজন্য কাশীর কবীর-চৌরা ও মগহর-উভয় স্থানই কবীরপন্থীদের তীর্থ হইয়া আছে।

(কবীরের বাণীর সংখ্যা ১৪৬৪-টি। সেগুলি এক একটি মহামূল্যবান রত্ন। ঐ সব বাণীর মধ্যে একটি তীক্ষ্ণ সত্যানুভূতি আছে। কবীরের দুই প্রধান শিষ্য শ্রুতগোপাল ও ভগোদাস বা ভগবান দাস সর্ব্বদা কবীরের সঙ্গে থাকিতেন এবং কবীর যখন যে বাণী বলিতেন, তাঁহারা সেটি লিখিয়া রাখিতেন। শ্রুতগোপালের সংগ্রহের নাম 'সুখনিধান' এবং ভগোদাসের সংগ্রহের নাম 'বীজক' বীজকের মধ্যে বহু ছন্দে বিবিধ ভাবের বাণী আছে।

(আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষ বিবদমান জাতি, নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ভ্রম ঘুচাইয়া সকলকে সত্য বিশ্বাসে মিলিত হইবার যে সাধনা করিয়াছে, কবীরের সাধনাও ছিল তাহাই। তাঁহার সেই সাধনা আমাদের বর্ত্তমানকে ও ভবিষ্যৎকে সুন্দর ও জয়যুক্ত করুক! কবীর ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের প্রেমের দ্বারা মিলন করার

সাধনাকে নাম দিয়াছিলেন 'ভারতপংথ'। এইরূপ ভারতপন্থীদের সাধনার বলেই ভারতে জগন্নাথের রথ চলিবে। সকল সম্প্রদায় একযোগে রথের রশি টানিলে তবেই জগন্নাথের রথ সচল হইবে, একথা কবীর বুঝিয়াছিলেন। সকল তীর্থের পবিত্র বারি সংগ্রহ করিয়া পুরুষোত্তমের পূর্ণাভিষেক ভারত-পথিকদেরই করিতে হইবে। কবীরের দেশবাসী সকলকে এই ভারতপন্থী হইয়া সত্যধর্ম্মে মিলনের সাধনা করিতে হইবে এবং তাহার দ্বারা আজিকার দিনের এই সাম্প্রদায়িকতা চিরতরে লোপ পাইবে। আজ ভারতবর্ষে কবীরের মতো মহাত্মার প্রয়োজন হইয়াছে।

নানক

কালে কালে মানুষের ধর্ম্ম যখনই সাময়িক ও সামাজিক রীতিতে প্রথায় ও সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া তাহার সক্রিয়তা ও গতি হারাইয়াছে, তখনই ধর্ম্মকে নূতন জীবন ও সচলতা দান করিবার জন্য এক একজন মহামানবের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই পুরুষধর্ম্মী মহামানব নিজের স্বাধীন প্রমুক্ত ও সুদূরপ্রসারিত মননের দ্বারা ধর্ম্মকে গতি ও মুক্তি দান করেন। এই কথাই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হইয়াছে—

> যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুৎথানম্ অধর্ম্মস্য, তদাঽঽত্মানং সৃজাম্যহম্॥

এই সংসারে যখনই ধর্ম্মের সঙ্গে অজ্ঞানের ও কুসংস্কারের জালজঞ্জাল জড়াইয়া ধর্ম্মের স্বচ্ছতা আচ্ছন্ন হইয়া যায়, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অথবা অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে, তখনই অবতারের আবির্ভাব হয়।

এই-সব অবতার এক-একজন ধর্ম্মসংস্কারক প্রোটেষ্টান্ট্। অতি আদিম কাল হইতে ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ধর্ম্ম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইলেই প্রচলিত বিশ্বাসের প্রতিবাদী একজন তাহার সংস্কারে অগ্রসর হইয়াছেন।

ভারতে ধর্ম্মবিশ্বাস যখন নানা কুসংস্কারে ও অজ্ঞানের আবরণে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে ভারতে মুসলমানদের

অভ্যাগমন হইল। মুসলমান ধর্ম্মের আলোকে সে যুগে ভারতীয় ধর্ম্ম এক নব ভাব ধারণ করিতে লাগিল, আবার স্বাধীন চিন্তা ও বুদ্ধির প্রমুক্তি দেশে দেখা দিল। এই সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ লোকগুরু হইলেন রামানন্দ। ভারতে সর্ব্বজনীন ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য গুরু রামানন্দের পুণ্য নাম চিরপূজনীয় হইয়া আছে। ব্রাহ্মণকুলতিলক হইয়াও তিনি অব্রাহ্মণ নানা জাতির বারো জন শিষ্যকে তাঁহার সার্ব্বজনীন উদার সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে জোলা কবীর, মুচি দাদু, ও চামার রবিদাস প্রধান ছিলেন। বুদ্ধদেব যেমন চলিত দেশ-ভাষায় তাঁহার ধর্ম্ম-উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তেমনই কবীর মধ্যযুগে প্রথম চলিত দেশভাষায় ধর্ম্ম-উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। কবীর ও দাদূর পরে বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব ও মথুরায় বল্লভাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মকে এক নব প্রেরণা দান করেন এবং দেশ-ভাষায় উপদেশ দিয়া ধর্ম্মবোধ সাধারণ নরনারীর মনেও পৌঁছাইয়া দেন।

এই-সমস্ত ঘটনা খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীর। এই সময়ে পৃথিবীময় জ্ঞান ও ধর্ম্মের বহিয়াছিল। এইজন্য এই দুই শতাব্দী মানবের ইতিহাসের অতি মহৎ স্মরণীয় কাল। এই সময়ে ইউরোপে ও ভারতে বুদ্ধির জাগরণের, সত্য দর্শনের ও গভীর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বহু শতাব্দীর নিষ্ক্রিয় জড়তা পরিহার করিয়া এই যুগে বহু মনীষী স্বাধীন প্রমুক্ত বুদ্ধির পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে অজ্ঞান ও কুসংস্কারের

অন্ধকারের বিরুদ্ধে জ্ঞানের ও বুদ্ধির আলোকের বিদ্রোহ বিঘোষিত হওয়াতে মানুষ দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডের কাব্য-সাহিত্য চসার ও গাওয়ারের প্রতিভায় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। জার্ম্মানীতে মার্টিন লুথার, ইংল্যাণ্ডে টমাস্ ক্র্যান্‌মার, স্কট্‌ল্যাণ্ডে জন নকস্, ফ্রান্সে জন ক্যাল্‌ভিন্, সুইজারল্যাণ্ডে উল্‌রিচ্ জুইঙ্গ্‌লী প্রভৃতি ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম-সংস্কারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ধর্ম্মের উন্নতি ও সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার পার্থিব বিষয়েরও উদ্ভাবনা ও আবিষ্কার হইতেছিল। এই সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয়। কলম্বাস ও আমেরিগো ভেস্পুচি নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করেন। ভাস্কো দা গামা ইউরোপ হইতে ভারতে আসিবার জলপথ আবিষ্কার করেন। মাইকেল এঞ্জেলো, র্যাফেল, লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চি প্রভৃতি ওস্তাদ চিত্রকরেরা আর্টের ধারণা উন্নত করিয়া তুলেন। এই সময়েই তৈমুরলঙ্গ ভারত-বিজয়ে আসিয়া ভারতের বহুযুগ-সঞ্চিত কূপমণ্ডুকতাকে আঘাত করেন। এই সময়ে বঙ্গদেশে চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস ও মিথিলায় বিদ্যাপতি আবির্ভূত হইয়া ভাষাকে একটি নূতন ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দান করেন।

বুদ্ধির জাগরণের ও মননশীলতার এই যুগে গুরু নানকের আবির্ভাব হয়। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখী শুক্ল-পক্ষে পঞ্জাব দেশে লাহোর জেলায় কনকাচ নামক গ্রামে মাতামহের আলয়ে নানকের জন্ম হয়

নানকের পিতার নাম ছিল কালু, মাতার নাম ছিল তৃপ্তা। কালু বেদী-ক্ষত্রিয় বংশের লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি বৈশ্যকর্ম্ম করিতেন, তিনি শস্য-বিক্রেতা ছিলেন। তাঁহারা রাবী নদীর তীরবর্ত্তী তালবন্দী গ্রামে বাস করিতেন। নানকের জীবনের বহু খুঁটিনাটি বিবরণ তাঁহার ভক্তেরা ও মুসলমান ঐতিহাসিকেরা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।

স্বাভাবিক বৈরাগ্য ও মুক্ত বুদ্ধি লইয়া নানক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নাকি মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সেই হরিকথা বলিতে ও শুনিতে ভালবাসিতেন। সাত বৎসর বয়সে নানকের বিদ্যারম্ভ হয়। যে-গুরুর কাছে নানকের বিদ্যারম্ভ হয়, তাঁহার নাম ছিল সৈয়দ হোসেন। শিক্ষক একখানি কাঠের পাটায় অক্ষর লিখিয়া নানককে পরিচয় করিতে দেন। নানক তাহা দেখিয়া প্রথমেই বলিলেন—ওঁ সতি গুরু প্রসাদি—ওঁ সত্য গুরুর মহাপ্রসাদ এই বিদ্যা! গুরু নানকের এই বাণী তাঁহার বচন-সংগ্রহের প্রথমেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনী-লেখকেরা বলেন যে, নানক শৈশবেই হিন্দুর ও মুসলমানের সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু নানক যে আরবী ফার্সী ও সংস্কৃতভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব তিনি শিক্ষকদের মুখে শুনিয়া এবং নিজের সহজাত তীক্ষ্ণ ধর্ম্মবুদ্ধির সাহায্যে সকল ধর্ম্মের সার সত্য আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

নানক অতি শৈশবেই যে-সব ধৰ্ম্মকথা বলিতেন, তাহা এমন উদার সংস্কারমুক্ত সার্ব্বজনীন হইত যে, হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার মুখে সেই ধৰ্ম্মতত্ত্ব শুনিবার জন্য সমবেত হইত।

'জনম-সাখী' অর্থাৎ জন্মসাক্ষী নামক তাঁহার জীবনচরিতে বর্ণিত আছে যে, পাঠশালার লেখাপড়া শেষ করিয়া নানক বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত এবং কতুবুদ্দিন মুল্লার কাছে পারসী আরবী শিক্ষা করেন এবং তিনি শৈশবেই আরবী ও সংস্কৃত বর্ণমালার প্রত্যেকটি অক্ষর আদিতে দিয়া মধ্যযুগের বাংলার চৌতিশা স্তবের ন্যায় গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ ভগবদ্-বন্দনা রচনা করেন।

নানক শিক্ষকদের সহিত ধৰ্ম্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা তর্ক করিতেন। শিক্ষকেরা নানকের অসাধারণ ধীশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন এবং অনেক সময়ে পরাজিত হইয়া লজ্জা পাইতেন। এইজন্য তাঁহারা নানকের পিতাকে একদিন বলিলেন যে, তোমার পুত্রের বিদ্যা-শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে তোমরা গৃহে লইয়া যাও।

নানক জগদ্‌গুরু হইয়া জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহার মহত্ত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। নানকের কোনো কার্য্যে মন ছিল না, কেবল উদাস ভাবে বসিয়া চিন্তা করিতেন, এবং সাধু-সন্ন্যাসী ফকির দেখিলেই তাঁহাদের সঙ্গ লইতেন। পিতা তাঁহাকে ধরিয়া

আনিয়া তিরস্কার করিতেন, প্রহার করিতেন, কাজে লিপ্ত হইতে আদেশ করিতেন।

বৈশ্য-বৃত্তি কালু নানকের সাংসারিক বিষয়ে উদাসীনতা পছন্দ করিতেছিলেন না। তিনি একদিন নানককে অনুরোধ করিলেন—নানক, তুমি কৃষিকর্ম্মে মন দাও।

নানক পিতাকে উত্তর দিলেন—এই তনুই ভূমি, তাহার বীজ সৎকর্ম্ম, তাহার সলিল আপনি শার্ঙ্গপাণি ধনুর্দ্ধর ভগবান। হে মন-কৃষাণ, হৃদয়ে হরি-রূপ শস্য রোপণ করো, তাহাই উদ্ধারের উপায়।

কালু তখন পুত্রকে পাগল বলিয়াই স্থির করিলেন।

একদিন বালক নানক বিপাশা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, কয়েকজন ব্রাহ্মণ জলদান করিয়া পিতৃ-পুরুষের তর্পণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া নানক অঞ্জলি জলপূর্ণ করিয়া ক্রমাগত নদীতীরে সেচন করিতে লাগিলেন। অল্পবয়স্ক বালককে বিনা-প্রয়োজনে তীরে জল সেচন করিতে দেখিয়া, তাহার খেলা কেমনতর জানিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার উত্তরে নানক বলিলেন যে—"আমি আমার তালবন্দীর শাকের ক্ষেতে জল দিতেছি।" ব্রাহ্মণেরা বালকের বাতুলতা দেখিয়া বলিলেন,—"তুমি কেমন পাগল, কোথায় তালবন্দী গ্রামে তোমার শাকের ক্ষেত রহিয়াছে, আর এখানে জল দিলে সেখানে শাকের ক্ষেতে জল পৌঁছিবে"! নানক বলিলেন,—"আপনাদের

পিতৃপুরুষ কে কোথায় আছেন তাহার ঠিকানা নাই, আপনাদের দেওয়া জল যদি তাঁহাদের কাছে পৌঁছিতে পারে, তবে আমার জল অল্প দূরের তালবন্দী গ্রামের শাকের ক্ষেতে পৌঁছিবে না কেন?" বালকের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহারা তাঁহাদের আচরণের অসারতা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করিলেন।

নয় বৎসর বয়সে নানকের উপনয়ন-সংস্কার করিবার আয়োজন হয়। তাঁহাদের কুল-পুরোহিত তাঁহাকে উপবীত পরাইতে উদ্যত হইলে নানক পুরোহিতকে বলেন—আপনি আমাকে যে উপবীত দিতেছেন, তাহা ধারণ করিলে আমার কি লাভ হইবে, আর ধারণ না করিলে কি ক্ষতিই বা হইবে? ইহাতে পুরোহিত বলিলেন—ইহা ধারণ করিলে তোমার হাতের জল শুদ্ধ হইবে, সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্মে তোমার অধিকার জন্মিবে। তখন নানক একটি শ্লোক বলিয়া উঠিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—দয়া-রূপ কার্পাস, সন্তোষ-রূপ সূত্র, ইন্দ্রিয়দমন-রূপ গ্রন্থি, এবং সত্য-রূপ দণ্ডী যে উপবীতের, তাহাই জীবের যথার্থ উপবীত। হে পণ্ডিত, যদি এইরূপ উপবীত থাকে, তবে তাহাই ধারণ করো। এরূপ উপবীত ছিন্ন বা মলিন হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না।

পুত্রকে সংসার সম্বন্ধে এইরূপ উদাসীন ও ধ্যান-নিমগ্ন দেখিয়া সংসারে মন দেওয়াইবার জন্য নানকের পিতা নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন পুত্রকে ২০৲ টাকা পুঁজি মূলধন দিয়া বলিলেন—তুমি একটি মুদির দোকান করো

এবং এই টাকা লইয়া শহর হইতে কিছু কিছু দ্রব্য কিনিয়া আনো।

নানক শহরে রওনা হইলেন। কালু পুত্রকে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না, সেইজন্য নানককে একাকী না পাঠাইয়া তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের বিশ্বাসী ভৃত্য বালসিন্ধুকে প্রেরণ করিলেন। নানক পথে এক সন্ন্যাসীকে দেখিলেন এবং সন্ন্যাসীর ত্যাগের ও জ্ঞানের পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার দোকানের সমস্ত পুঁজি কুড়ি টাকাই সেই ফকীরকে দান করিলেন।

নানক বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে কালু পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি কি ক্রয় করিয়া আনিলে?

নানক উত্তর দিলেন—সন্তোষ, আর সাধুসঙ্গের আনন্দ!

ইহাতে নানকের পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ফলে নানককে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইল।

মাতার অনুরোধে, পিতার তিরস্কারে, কিছুতেই নানকের মন কর্ম্মে নিবিষ্ট হইল না। তখন নানকের পিতা কালু নানককে বলিলেন—তোমার ভগিনীপতি জয়রাম দৌলত খাঁর জমনবীশ,—তুমি তাঁহার কাছে যাও, সে তোমাকে একটা চাকরী করিয়া দিবে।

নানক বলিলেন—আমি যে প্রভুর চাকর, তিনি আমার কোনো অভাবই রাখেন নাই। আমি তাঁহারই ভৃত্য যিনি অতুলনীয়, যাঁহার সমান কেহ নাই, এবং যাঁহার রাজত্ব

কিন্তু নানককে শেষ পর্য্যন্ত জয়রামের নিকটে যাইতে হইল। সেখানে জয়রাম নবাবকে বলিয়া শ্যালকের একটি চাকরী করিয়া দিলেন। নানকের চেহারা দেখিয়া নবাব বলিলেন—ইহাকে অত্যন্ত বিশ্বাসী বলিয়া মনে হইতেছে! ইহাকে খাজনা আদায়ের কাজ দেওয়া হোক।

নানক নবাবের খাজনা আদায় করিয়া উহা সাধুসেবায় সদাব্রত দিয়া ব্যয় করিতে লাগিলেন। ইহাতে নবাব তাঁহাকে ডাকাইয়া হিসাব তলব করিলেন। কিন্তু হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, নবাবের খাজনা সব ঠিক আছে, বরং তহবিলে টাকা উদ্‌বৃত্ত হইয়াছে। নবাব সেই টাকা নানকের প্রাপ্য বলিয়া তাঁহাকে দান করিলেন, এবং নানক সেই টাকায় সাধুসেবা করিলেন।

নানক খাজনার শস্য ওজন করিয়া লইতেন। এক দুই করিয়া দাঁড়িপাল্লার ফেরা ওজন করিতে করিতে যখন তেরো সংখ্যায় আসিতেন, তখন তিনি সেইখানে থামিয়া কয়েকবার 'তেরো তেরো' বা 'তেরা তেরা' উচ্চারণ করিতেন—পাঞ্জাবী ভাষায় তেরো অথবা তেরা মানে ত্রয়োদশ ও তোমার উভয়ই হয়। 'তেরো তেরো' বলিয়া নানক এই কথা ভগবানকে বলিতেন যে, হে প্রভু, আমি তোমার, জগতের যাবতীয় বস্তু তোমার।

নানক আদায়-করা খাজনার, এমন কি নিজের উপার্জ্জন দান করিয়া অপব্যয় করেন, এই সংবাদ পাইয়া নানকের পিতা পুত্রের অপব্যয়ের উপর নজর রাখিবার জন্য তাঁহাদের এক-

বিশ্বাসী ভৃত্যকে নানকের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্যের নাম মর্দ্দানা, তিনি জাতিতে ছিলেন ডোম। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বাজনদারের কাজ করিতেন। মর্দ্দানা 'রবাব' নামক বীণায় সুন্দর আলাপ করিতে ও গান করিতে পটু ছিলেন। আহারাদির পরে নানক যখন হরি-ভজন করিতেন, তখন মর্দ্দানা রবাব বাজাইয়া সঙ্গত করিতেন। সুতরাং মর্দ্দানাকে পাইয়া নানকের হরি-ভজনের সহায়তা হইল—ভৃত্যের বীণার সহিত সুর মিলাইয়া তিনি হরি-ভজন শুরু করিলেন।

এই সময়ে নানক একদিন অরণ্যে প্রস্থান করিলেন ও কয়েক দিন সেখান হইতে নির্গত হইলেন না। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল যে, নানক সরকারী টাকা ভাঙিয়া পলায়ন করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ নানকের হিসাব তলব করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য—হিসাব পরীক্ষা করিয়া ৭৮০৲ টাকা অধিক উদ্‌বৃত্ত হইল।

বনের মধ্যে বহু সাধু ফকীর ও পীরের সঙ্গ করিয়া ও বহু অলৌকিক প্রলোভন জয় করিয়া নানক বন হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার পরিধানে তখন কেবল মাত্র এক কৌপীন। দৌলত খাঁ নানকের বেশ দেখিয়া বুঝিলেন যে, গুরু এইবার সংসার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কিন্তু তাঁহার মতন বিশ্বাসী দক্ষ কর্ম্মচারীকে হারাইতে হইবে বলিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি নানককে বলিলেন যে, এই উদ্‌বৃত্ত টাকা তোমার, ইহা লইয়া তুমি কোনো ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হও। নানক

কহিলেন, ও টাকা আমার নয়, উহা সকল সাধু ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিন।

এই সময়ে নানকের কাছে যে-কেহ যাইত, তাহাকেই তিনি বলিতেন যে—হিন্দুও কেহ নাই, মুসলমানও কেহ নাই। নানকের এই কথা কাজীর কর্ণগোচর হইল। নানক নবাবের প্রিয়পাত্র বলিয়া কাজী নিজে নানককে কোনো শাস্তি দিতে সাহস করিলেন না, তিনি নবাবের কাছে নানকের নামে নালিশ করিলেন—মুসলমান কেহ নাই! এত বড় স্পর্দ্ধার কথা নানক বলে!

নবাব নানককে আহ্বান করিয়া আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —মুসলমান কেহ নাই এই কথার অর্থ কি?

উত্তরে নানক বলিলেন—সত্যই মুসলমান হওয়া বড় মুস্কিল! মুসলমান হইতে হইলে শ্রেষ্ঠ সাধুদের মিষ্টান্ন এবং উত্তম বস্তু-সকল দান করিতে হয়। মুসলমান হইতে হইলে দানশীল হইতে হয়, এবং জীবন-মরণের ভ্রম দূর করিতে হয়। ভগবানের ইচ্ছা শিরোধার্য্য করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে মানিয়া অহঙ্কার দূর করিতে হয়। সকল জীবের প্রতি দয়া করিতে হয়। এ সকল হইলে তবে তাহাকে মুসলমান বলা যায়:—

মুসলমান কহাবন মুস্কিল, যা হোই তা মুসলমান কহাবৈ।
অব্বল অউলি দান করি, মিট্টা মস্কলমানা মুসাবৈ॥
হোই মুসল্লিমু দীন মুহানৈ, মরণ-জীবন-কা ভর্ম্ চুকাবৈ॥

রবুকি রজাই মন্নে শির উপর, কর্ত্তা মন্নে আপ গবাবৈ ॥
তৌ নানক সর্ব্ব জীয়া মিহরম্ম্, তি হোই ত মুসলমান কহাবৈ ॥

নবাব নানকের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং কাজীকে নানকের উপর ক্রোধ করিতে নিষেধ করিলেন।

নানকের বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদের ও তাহার চার বৎসর পরে কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীচাঁদের জন্ম হয়। ইহার পরে নানক সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীন বেশে নানা তীর্থভ্রমণে বাহির হন। পরিব্রাজক-বেশে নানা দেশে পর্য্যটন করিবার সময় তাঁহার চরিত্র-প্রভাবে অনেক দস্যু ও কুক্রিয়াসক্ত বিষয়ী ব্যক্তি সৎপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার অনেক কাহিনী আছে। তাঁহার ভজনের প্রভাবে কুষ্ঠরোগীর আরোগ্য-লাভের কাহিনীও আছে।

নানকের তীর্থ পর্য্যটনের সমস্ত বিবরণ ভাই গুরু বলী নামক এক ভক্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, নানক পূর্ব্বদেশে বাংলার ভিতর দিয়া কামরূপ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, এবং কিম্বদন্তী যে সেখানে যাইবার সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগরী ঢাকার উপর দিয়া গিয়াছিলেন। গুরু নানকের পদধূলিতে ঢাকা পবিত্র হইয়া আছে। ঢাকায় গুরু নানকের পদার্পণের চিহ্ন স্বরূপ নানক-কুয়া আজিও বিদ্যমান আছে, এবং ঢাকা শিখদের একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। নানক পশ্চিম দিকে তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে পারস্যের ভিতর দিয়া আরব দেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এমন কিম্বদন্তীও আছে।

ভাই গুরু বলী তাঁহার 'জ্ঞানরত্নাবলী' গ্রন্থে নানকের মক্কাযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন। নানক সত্যান্বেষী হইয়া যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত লোকেদের নানা প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। মক্কায় গিয়া তিনি একদিন কাবা-মসজিদের দিকে পা করিয়া শুইয়া ছিলেন। তাঁহাকে ঐরূপে পবিত্র মসজিদের অবমাননা করিতে দেখিয়া এক মোল্লা মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হন। তখন নানক সেই মোল্লাকে প্রশ্ন করেন—দেব মন্দির কোথায়? উহা যদি দেব-মন্দির হয় তবে উহাতে কোনো দেবতার মূর্ত্তি নাই কেন? দেব-মূর্ত্তি তো তোমরা দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়াছ।

মোল্লা বলিলেন—আমরা তো মানুষের হাতের তৈয়ারি কোনো বস্তুকে পূজা করি না, আমরা এক অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের পূজা করিয়া থাকি।

ইহার উত্তরে নানক বলিলেন—তবে কি তোমাদের এই মন্দির মানুষের হাতের তৈয়ারি নয়, ইহা কি সীমাবদ্ধ জড়বস্তু নয়? আর তোমাদের আল্লাহ্ যদি সর্ব্বব্যাপী হন, তবে তিনি কি কেবল ঐ মন্দিরটুকুর দেওয়ালের মধ্যেই বন্দী হইয়া আছেন? তাই যদি হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ যেদিকে নাই সেদিকে আমার পা দুটা ফিরাইয়া দাও।

মোল্লা নানকের জ্ঞান ও শ্লেষ বুঝিয়া লজ্জিত হইয়া বিদায় হইলেন।

নানক যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই ধার্ম্মিক লোকেদের

কাছে সত্যানুসন্ধান করিয়াছেন, পরমেশ্বরের স্বরূপ ও শান্তি-লাভের উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। তিনি কাহারও কাছে সত্যের সন্ধান না পাইয়া বলিয়াছেন—আমি কোরান পুরাণ কত শাস্ত্র পাঠ করিলাম, কিন্তু কাহারও মধ্যে তো সম্পূর্ণ সত্য-বিশ্বাস খুঁজিয়া পাইলাম না। সকলেই নিজের কালের ও দেশের সঙ্কীর্ণ সংস্কারের দাস।

তীর্থভ্রমণের সময়ে বহু মুসলমান ফকীর পীর প্রভৃতির সহিত নানকের মিলন ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

নানক সিংহলে গিয়া সেখানকার এক রাজা শিবনাভিকে পর্য্যন্ত সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। দক্ষিণ দিক হইতে ফিরিয়া তিনি হিমালয়ে গমন করেন ও অনেক সাধু মহাত্মার সঙ্গে মিলিত হন।

গুরু নানক বারো বৎসর নানা তীর্থপর্য্যটন করিয়া পিতা-মাতার আহ্বানে একবার দেশে ফিরিয়া যান। তিনি যখন সৈয়দ-পুরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে সম্রাট্ বাবর পঞ্জাব বিজয়ে আসিয়াছিলেন। তিনি সৈয়দপুর দখল করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময়ে তাঁহার সৈন্যদের একটি ঘোড়া ও একটা মোট বহিবার জন্য সৈনিকেরা নানককে ও তাঁহার সহচর মর্দ্দানাকে বেগার ধরিল। তাহারা নানকের মাথায় মোট চাপাইয়া দিল, এবং মর্দ্দানাকে দিল ঘোড়া লইয়া যাইবার ভার। নানক পথ চলিতে চলিতে মর্দ্দানাকে বলিলেন—মর্দ্দানা, মুখ বুজিয়া পথ চলিয়া কি হইবে? চলো, প্রভুর নাম কীর্ত্তন

করিতে করিতে যাই। ধরো তোমার রবাব, বাজাও তাহাতে মোহন সুর।

মর্দ্দানা বলিলেন,—কেমন করিয়া রবাব বাজাইব?—হাত যে জোড়া, আমার হাতে যে ঘোড়ার দড়ি রহিয়াছে।

নানক বলিলেন—ছাড়িয়া দাও ঘোড়া, সে তোমার রবাবের মধুর রবে আকৃষ্ট হইয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে আপনিই চলিবে।

তখন নানক ধরিলেন ভজন গান, আর সঙ্গত করিতে লাগিলেন মর্দ্দানা। এই বার্ত্তা বিজয়ী-বীর বাবরের কর্ণগোচর হইল। তিনি তখন নানকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, এবং তাঁহাকে সমাদর করিয়া মুক্তি দিলেন।

ইহার পর নানক লাহোর হইতে তালবন্দী গ্রামে গিয়া কিছুদিন স্বগৃহে পিতামাতার নিকটে বাস করেন। কিন্তু গৃহে তাঁহার মন টিকিল না।

নানক পুনরায় তীর্থভ্রমণে নির্গত হন। কিন্তু তীর্থভ্রমণেও তাঁহার মন শান্তি লাভ করে নাই, তাহা তিনি অনেক শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

তীর্থে গমন করিলে মনের বাসনা দূর হয় না এবং মনের গর্ব্ব ও অহঙ্কার ক্ষয় হয় না। বহু সাধনা করিলেও মন হইতে বিষয়-বাসনা দূর হইতে চাহে না। জল দ্বারা ধৌত করো, তথাপি দেহে অনেক দুর্নীতি থাকিয়া যায়। কাঁচা ইটের গাঁথনিতে কি কখনো পাকা ভিত্তি গঠন করা যায়? মন হরি-

নামের মহিমাতেই উচ্চ হয়। অসংখ্য পতিত ব্যক্তি ভগবানের নামে উদ্ধার পায়।

তিনি আরও বলিয়াছেন—তীর্থস্নান করিতে পারি, যদি তাঁহার অনুভূতি পাই; বিনা অনুভবে স্নান করিয়া কি হইবে?

গুরু নানক নানা প্রলোভন জয় করিয়া সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। ঐ সকল প্রলোভনকে নানক কলির প্রলোভন বলিয়াছেন। সয়তান যেমন ক্রাইষ্ট্‌কে প্রলোভন দেখাইয়া নিজেই পরাজিত হইয়াছিল, এবং ক্রাইষ্ট্‌ প্যারাডাইস্‌ রিগেন্‌ড্‌; নানকও তেমনি কলির প্রলোভন জয় করিয়া নিজের মহত্ত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। মর্দ্দানা কলির ভয়ে ভীত হইলে নানক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—কেবল মাত্র ভগবানের ভয় মনে রাখিও, তাহা হইলে আর কেহই তোমাকে ভয় দেখাইতে পারিবে না।

নানকের সহিত নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া পথশ্রমে অনাহারে নিরাশ্রয়ে মর্দ্দানা কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি গুরুকে বলিলেন—প্রভু, এ তোমার কেমন রীতি, কোথাও তুমি আশ্রয় লও না, কিছু আহার করো না, পথ হাঁটিতে তোমার ক্লান্তি নাই, এমন অবস্থায় তোমার সঙ্গে আমার কেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো পোষাইবে? তুমি তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা যেমন করিয়া দূর করো, যেমন করিয়া ক্লান্তি অপনোদন করো, সেই কৌশল আমাকে শিখাইয়া দিলে, আমি তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি।

ইহার উত্তরে নানক বলেন—তুমি পরমেশ্বরে নির্ভর করিয়া থাকো, তাহা হইলে তোমার ইহ-পরলোকে কল্যাণ হইবে। কেবল পরমেশ্বরকে চিন্তা করো, ধ্যান করো, নামরসে মগ্ন থাকো।

তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে একবার করতারপুরে আসিলে নানকের বিশ্বাসী অনুচর মর্দ্দানা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার জীবনের অবসান সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে। মৃত্যুর পরে তাহার দেহের কি প্রকারে সৎকার করা হইবে এই চিন্তা মর্দ্দানাকে ব্যাকুল করিল। মর্দ্দানা নানককে তাহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। নানক বলিলেন কেহ বা কবর দেয়, কেহ বা দেহ জলে ভাসাইয়া দেয়, কেহ বা দাহ করে। তোমার যাহা ইচ্ছা সেইরূপেই তোমার সৎকার করিব। তুমি যদি ইচ্ছা করো তাহা হইলে তোমার দেহের উপর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তোমাকে অমর করিয়া রাখিব।

ইহাতে মর্দ্দানা বলিলেন—আমার অমর আত্মা যখন নশ্বর দেহ-মন্দির ছাড়িয়া প্রয়াণ করিতেছেন, তখন এই নশ্বর দেহকে রক্ষা করিবার জন্য আমার কোনো আকিঞ্চন নাই। যে দেহ হইতে আত্মা মুক্ত হইয়া যাইতেছেন, সেই দেহকে আবার কবরের কারাগারে বন্দী করিয়া কি লাভ হইবে?

নানক বলিলেন—তোমার তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যদর্শন হইয়াছে। তোমাকে আমি ব্রাহ্মণোচিত সৎকার করিব, তোমার দেহ আমি মুক্ত-স্রোতে ভাসাইয়া দিব।

মর্দ্দানা পরমেশ্বরের নাম করিতে করিতে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে রাবী নদীর তীরে দেহত্যাগ করিলেন এবং নানক তাঁহার দেহ নদীর স্রোতে বিসর্জ্জন করিলেন। মর্দ্দানার পুত্র শাহ্‌জাদা তখন হইতে পিতার ন্যায় গুরুর সেবার ভার গ্রহণ করিলেন এবং তিনিও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ছায়ার ন্যায় গুরুর সহচর হইয়া ছিলেন।

ইহার পরে নানকও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সকল শিষ্য অনুভব করিতে লাগিলেন যে, গুরু নানকের দেহ অবসানের সময় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। নানকের হিন্দু মুসলমান বহু শিষ্য তাঁহাকে অন্তিম দেখা দেখিয়া লইবার জন্য তাঁহার কাছে আসিতে লাগিলেন।

গুরু নানক মৃত্যু আসন্ন অনুভব করিয়া এক শুষ্ক বাবলা গাছের তলায় গিয়া বসিলেন। অমনি সেই শুষ্ক বৃক্ষ নাকি পত্র-পল্লবে সবুজ সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। গুরু নানকের আত্মীয়-স্বজন পুত্র-পরিবার সকলে তাঁহার কাছে আসিলেন এবং সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্ত মুসলমানেরা তাঁহার দেহ কবর দিবেন বলিয়া দাবী করিতে লাগিলেন, এবং ভক্ত হিন্দুরা দাবী করিতে লাগিলেন যে, তিনি হিন্দু তাঁহাকে হিন্দু রীতিতে দাহ করা হইবে। এই বিবাদ মীমাংসার জন্য অবশেষে তাঁহারা গুরু নানকের কাছেই গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবা নানক বলিলেন—মুসলমানেরা আমার দেহের বাম পার্শ্বে ফুল ছড়াইয়া দিক, আর হিন্দুরা আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ফুল বিকীর্ণ করুক।

যেদিকের ফুল আমার দেহাবসানের পরে তাজা থাকিবে, সেদিকের রীতি অনুসারেই আমার সংকার হইবে।

ইহার পরে বাবা নানক সমাধিতে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি পরমেশ্বরকে প্রণাম করিলেন এবং 'ওয়াহ্ গুরু' (হে গুরু) উচ্চারণ করিয়া একখানি চাদরে নিজেকে আচ্ছাদিত করিলেন।

পরদিন প্রভাতে তাঁহার দেহাবরণ চাদর খুলিলে দেখা গেল যে, সেই চাদরের তলায় কোনো দেহ নাই, কেবল হিন্দু-মুসলমানের দেওয়া ফুলগুলি সবই প্রস্ফুটিত ও তাজা হইয়া আছে। তখন হিন্দুরা তাহাদের দেওয়া ফুল এবং মুসলমানেরা তাহাদের দেওয়া ফুল লইয়া তাহাদের নিজের নিজের প্রথা অনুসারে নানকের দেহ সংকার করিতে গেল। এইরূপে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষে দশমী তিথিতে ৭০ বৎসর বয়সে বিপাসা নদীর তীরে কর্ত্তারপুর নগরে মহাত্মা নানকের দেহাবসান হইয়া অমৃতত্ব লাভ হইল।

যে স্থানে বাবা নানক দেহত্যাগ করেন, সেই স্থানে সকল ভক্ত প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং রাবী নদীর তীরে হিন্দুরা একটি মঠ ও মুসলমানেরা একটি সমাধি স্থাপন করিলেন। ভগবানের কৃপায় সেই দুইটি সমাধি-মন্দিরই নদীর ভাঙনে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভালোই হইয়াছে, নতুবা যে নানক এক অবিনাশী অলখ নিরঞ্জন ভগবানের পূজা প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং যিনি নানক নিরহঙ্কারী অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বরের পূজক নাম ধারণ

করিয়া সকলের সকল-প্রকার কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন, অবশেষে তাঁহাকেই সকলে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া দিত।

গুরু নানক যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন দেশে বৈষয়িকতা, কুসংস্কার, জড়তা এবং অজ্ঞতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মের নামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িকতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্ত সংশোধন ও সংস্কার করিবার জন্য নানক জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

গুরু নানকের শিষ্য-সম্প্রদায় এখন শিখ নামে পরিচিত। পঞ্জাবী ভাষায় শিষ্য শব্দ 'শিষ' রূপ লাভ করে, এবং সেই মূর্দ্ধণ্য ষ উচ্চারণ করা হয় খ। অতএব 'শিখ' অর্থ শিষ্য-সম্প্রদায়।

গুরু নানক ও তাঁহার পরবর্ত্তী গুরুগণ পঞ্জাবের গ্রাম্য ভাষাতেই সকল উপদেশ দান করেন। সে ভাষা পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর পঞ্জাবী ভাষা। তাহা এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গুরুদিগের সকল বাণী ঐ ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল, সে জন্য ঐ ভাষার নাম এখন হইয়াছে 'গুরুমুখী ভাষা'। শিখদিগের দশ জন গুরু পরে পরে আবির্ভূত হন, এবং তাঁহাদের সকলের ও অন্যান্য সাধক মহাত্মাদের বাণী একত্র সংগ্রহ করিয়া শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার নাম 'গ্রন্থ্-সাহেব'।

গুরু নানক হিন্দু সমাজের চারি জাতিকে এক জাতিতে

পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুর সহিত মুসলমানের ধর্ম্ম-সমন্বয় করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে মহাত্মা কবীরও এই সাধনার পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন, তাঁহার বাণী ও জীবনের প্রভাব নানকের সময়েও পঞ্জাবে বিশেষ প্রবল ছিল। এইজন্য নানকের কার্য্য অনেকটা সহজ হইয়াছিল। কবীরের অনেক বাণী শিখদিগের 'গ্রন্থ্-সাহেবে'র অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে। কবীরই প্রথম দেশ-ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। নানক কবীরের অনুবর্ত্তী। গুরু নানকের বাণীগুলি কবীরের বাণীর ন্যায় কবিত্বরস-সিঞ্চিত না হইলেও সত্যানুভূতিতে ও প্রমুক্ত জ্ঞানে চিত্তগ্রাহী।

নানকের সমস্ত বাণী তাঁহার সহচর ভক্ত মর্দ্দানা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা 'জপজী' নামে পরিচিত হইয়া আছে। গুরুর যে সকল বাণী মর্দ্দানার দেহত্যাগের পরে কথিত হয়, সেগুলি অন্য নানা লোকে সংগ্রহ করেন, সেই সংগ্রহ 'প্রাণসঙ্কলী' নামে 'গ্রন্থ্-সাহেবে'র মধ্যে পাওয়া যায়।

নানকের ধর্ম্ম হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত উপনিষদের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা মুসলমানের ধর্ম্মমতের সহিত সমন্বয়ীকৃত তিনি পরমেশ্বরকে নানা নামে উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি নাম-রূপের অতীত তাঁহাকে আমাদের দেওয়া যে নামে খুশী ডাকা যাইতে পারে। এইজন্য নানকের উক্তির মধ্যে অলখ নিরঞ্জন রাম হরি আল্লাহ্, সব রকমের নামই দেখা যায়। নানকের মতে

পরমেশ্বরই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু, তিনি সকল গুরুর গুরু। গুরু নানক কোরান ও বেদ উভয়কেই ভ্রমপূর্ণ বলিলেও কোনটিকেই একেবারে অস্বীকার করেন নাই। মুসলমানদিগের পরধর্ম্মবিদ্বেষ ও গোহত্যার তিনি প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। আবার হিন্দুর কুসংস্কার ও মূর্ত্তিপূজার তিনি তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সমস্ত মানব-সমাজ এক এবং তাহার উপাস্য পরমেশ্বর এক। গুরু নানক তাঁহার ধর্ম্মকে একতা ও সাম্যের ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এবং একেশ্বরবাদের সহিত নৈতিক বিশুদ্ধিতা মিলাইয়া তিনি পবিত্র ধর্ম্ম সর্ব্বজনীন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ভূলোক দ্যুলোকে যিনি নিত্যকাল বিরাজিত, একমাত্র সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে আমি স্বীকার করি, কোনো সম্প্রদায়ের দেবতাকে আমি স্বীকার করি না। "সভনা জীয়া-কা যো ইক দাতা সো মৈ বিসরি ন যাঈ"—সকল জীবের যিনি এক প্রতিপালক, তাঁহাকে আমি যেন ভুলিয়া না যাই।

নানকের মতে আত্মা অবিনাশী—ন জিউ মরৈ, ন ডুবৈ, ন তরৈ। ইহা উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণীরই প্রতিধ্বনি।

নানক সন্ন্যাসের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীচাঁদ উদাসী বৈরাগী হইয়াছিলেন ,বলিয়া নানক পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গদ নামক এক ধার্ম্মিককে দ্বিতীয় গুরুর পদে বরণ করেন। শ্রীচাঁদ যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহা 'উদাসী' নামে এখনও বিদ্যমান আছে।

শিখদিগের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য ক্রীশ্চানদের দশ অনুশাসনের ন্যায় পনের দফায় নির্দ্দিষ্ট আছে—

(১) প্রাতঃকালে 'গ্রন্থ্-সাহেবে'র কোনও অংশ পাঠ করিবে। (২) আহারের পূর্ব্বে 'জপজী' পাঠ করিবে। (৩) কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে অরদাদ্ করিবে অর্থাৎ প্রার্থনা করিবে। (৪) সন্ধ্যাকালে রহবাস পাঠ করিবে। (৫) শীতল জলে প্রত্যহ স্নান করিবে এবং প্রত্যহ দুইবার চুল আঁচ্ড়াইবে। (৬) প্রতিদিন দন্তধাবন করিবে। (৭) ধূমপান করিবে না। (৮) ব্যভিচার করিবে না। (৯) ভগবানকে মিষ্টান্ন নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ লোককে বিতরণ করিয়া তবে নিজে গ্রহণ করিবে। (১০) জুয়া খেলা করিবে না। (১১) বিবাহে পণ গ্রহণ করিবে না। (১২) সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। (১৩) দরিদ্র ও দুঃখীদিগকে দয়া করিবে। (১৪) চুরি প্রবঞ্চনা পরনিন্দা মিথ্যাচার মহাপাপ বলিয়া গণ্য করিবে। (১৫) ইন্দ্রিয় দমন প্রধান কর্ত্তব্য।

আমরা মহাত্মা গুরু নানকের পুণ্যচরিত্র আলোচনা শেষ করিলাম। এখন তাঁহার সহিত আমরা সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যিনি উপাস্য সেই এক অদ্বিতীয় অলখ নিরঞ্জন পরামেশ্বরকে প্রণাম করি—

এ হরি সুন্দর এ হরি সুন্দর!
তেরে চরণ-পর শির নমেঁ।
সেবক জনাকে সেব সেব পর,

প্রেমী-জনাকে প্রেম প্রেম পর,
দুখী-জনাকে বেদন বেদন,
সুখী-জনাকে আনন্দ এ ॥
বন বন-মেঁ সাঁবল সাঁবল,
গিরি গিরি-মেঁ উন্নিত উন্নিত,
সলিতা সলিতা চঞ্চল চঞ্চল,
সাগর সাগর গম্ভীর এ।
চন্দ্র সূরজ বরৈ নিরমল দীপা,
তের জগ মন্দির উজার এ ॥

হে হরি! হে মনোহর!
তুমি চির সুন্দর,
তোমার চরণে মাথা আপনি নমে!
সব সেবকের তুমি
আছ হে সবার মাঝে,
সকল প্রেমীর প্রাণে
রয়েছ প্রেমের সাজে,
দুখীর দুখের মাঝে
তোমারি চরণ রাজে,
আছ হে সুখীর সুখে চির-জনমে।
বনে বনে হে শ্যামল।
শ্যাম তুমি অবিরত,

পর্ব্বতে পর্ব্বতে
উদ্যত উন্নত,
নদীনদে নির্ঝরে
চঞ্চল জাগ্রত,
সিন্ধু সাগরে গম্ভীর ভরমে।
চন্দ্র-সূরজ সব
আরতি-প্রদীপ তব,—
তব জগমন্দির উজলি রমে। *

---

* কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ

মীরাবাঈ

ভারতের তপোবনে বৈদিক ঋষিগণ যে 'এক' 'অবর্ণ' 'অরূপ' পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, পৌরাণিক যুগে সেই একেরই বহুভাবে প্রকাশের বহু রূপকল্পনা হওয়াতে ও বহু নামে সেই এককে অভিহিত করাতে ঐক্যবোধ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পরে খ্রীষ্টধর্ম্ম ও ইসলামধর্ম্ম যখন আবার একেশ্বরবাদের বার্ত্তা লইয়া ভারতে প্রবেশ করিল, তখন ভারতের নানা প্রদেশে আবার একের পূজা প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই এককেও বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন নামে ডাকার ফলে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া চলিল। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধে যখন আবার ধর্ম্ম অধর্ম্মে পরিণত হইতেছিল, তখন মধ্যযুগে বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন সব সাধক সাধিকা ভক্ত জ্ঞানীর আবির্ভাব হইয়াছিল যাঁহারা সকল সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া বিশ্ববাঁশীর অনাদি একের সুর সকলকে শোনাইতে পারিয়াছিলেন। এই মধ্যযুগে ভারতবর্ষের ধর্ম্মজীবনে যেন একটি নূতন ভাবের প্লাবন বহিয়া চলিয়াছিল। ভারত তখন বহুবিচিত্রের মধ্যবর্ত্তী একেকে নূতন করিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

এই মধ্যযুগে ভারতের নানাদিকে নানা ভক্ত উদারহৃদয় জ্ঞানীর আবির্ভাব হইয়াছিল। রামানুজ ও রামানন্দ দাক্ষিণাত্যে

বৈষ্ণবধর্ম্মে ভক্তির আবেগ সঞ্চার করেন। রামানুজের শ্রীসম্প্রদায় বহু দেবতার উপাসনা বারণ করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। কিন্তু ঐ সম্প্রদায়ের আচার্য্যেরা নিজেরা নীচ জাতীয়দের সংসর্গ পরিহার করিয়া জাত বাঁচাইয়া চলিতেন। রামানন্দ জাতের গণ্ডি প্রথম ভঙ্গ করিয়া বিভিন্ন জাতিকে নিজের শিষ্য করেন এবং তাহার ফলে তিনি সমাজ-চ্যুতও হন। রামানন্দের অব্রাহ্মণ দ্বাদশ শিষ্যদের মধ্যে দাদূ, কবীর, পীপা, রুইদাস প্রধান। এই যুগেই পাঞ্জাবে নানক, কাশীতে তুলসীদাস, মহারাষ্ট্রে তুকারাম ও নামদেব, বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ আবির্ভূত হইয়া ভারতে ভক্তির ও উদার মতের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং দেশবাসীর সংস্কার-সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিকে মুক্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।

এই যুগেই অসামান্যা ভক্তিমতী মীরাবাঈ আবির্ভূতা হন। তাঁহার আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। মীরা ছিলেন নারী, রাজকন্যা, রাজরাণী, অন্তঃপুরিকা— তথাপি তাঁহার ভক্তির আবেগ তাঁহাকে সকল সংস্কার ও সকল আসক্তি হইতে মুক্ত করিয়া সন্ন্যাসিনী পথচারিণী করিয়া ছাড়িয়াছিল। ভারতবর্ষের মত সংস্কার-শাসিত দেশে এ যে কত বড় কঠিন সাধনা, তাহা আমরা সহজেই ধারণা করিয়া লইতে পারি।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আগাগোড়া সন্দেহাচ্ছন্ন। মীরার জীবনেতিহাসও যথেষ্ট সম্পষ্ট নহে। মীরার আবির্ভাবকাল আনুমানিক ষোড়শ শতক। সকল লোকোত্তর-চরিত ব্যক্তির

জীবনকাহিনী যেমন সত্য ও কল্পনা, স্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনায় বিজড়িত হইয়া যায়, মীরা বাঈর জীবনকাহিনীতেও তেমনি বহু ইতিহাস-বিরুদ্ধ কাল্পনিক কিম্বদন্তী জড়িত হইয়া গিয়াছে। কাহিনীগুলি এমনই মনোরম যে, সেগুলির সত্যাসত্য কেহ বিচার করে না। সুতরাং সত্য নির্ণয়ের ভার ঐতিহাসিক-দের উপর দিয়া আমরা তাঁহার জীবনের কাল্পনিক অলৌকিক সকল কথাই আলোচনা করিয়া দেখিব।

মাড়োয়ার দেশে মেড়তা নামে একটি পরগণা আছে। সেইখানকার অধিপতি ছিলেন এক রাঠোর সামন্ত—তাঁহার নাম ছিল রতন সিংহ। এই রতন সিংহ ছিলেন মাড়োয়ারের রাণা রাও যুধাজীর পৌত্র। ইহারই কন্যার নাম মীরাবাঈ। মীরা বাল্যাবধি অসামান্যা রূপবতী ছিলেন। যে তাঁহাকে দেখিত সেই তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইত।

এই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মীরার কণ্ঠস্বরে এমন একটি মোহিনী মাধুরী এবং সঙ্গীতের সহজ পটুত্ব ছিল যে, তাহাতে তিনি সহজেই সকলের আদরভাগিনী হইয়াছিলেন।

মীরা বাল্যকাল হইতেই নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন ও আপন মনে গান গাহিতেন। তবে তিনি অন্য গান অপেক্ষা হরিভক্তি বিষয়ক গান গাহিতেই অধিক ভালবাসিতেন।

মীরা বাল্যকালে কোনো প্রতিবেশিনী বালিকার বিবাহের উৎসব দেখিয়া তাঁহার মাকে জিজ্ঞাসা করেন—মা, আমার স্বামী কে? উত্তরে তাঁহার মাতা মীরাকে তাঁহাদের গৃহদেবতার বিগ্রহ

দেখাইয়া বলেন যে, এই 'গিরিধারীলাল' তোমার স্বামী। বালিকা মীরা সেই দিন হইতে গিরিধারীলালকেই আপনার স্বামী জানিয়া তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভক্তি দিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্বস্বামী এইরূপে মীরার পার্থিব স্বামীর আসন আগেই বেদখল করিয়া বসিলেন।

এই গিরিধারী সম্বন্ধে আর একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তখন মীরার বয়স বার বৎসর। একদিন মীরার পিতৃগৃহে এক সন্ন্যাসী আসিয়া অতিথি হন। তাঁহার কাছে একটি গিরিধারী-লালের বিগ্রহ ছিল। বালিকা মীরা ঐ প্রতিমাটি লইবার জন্য বায়না ধরেন। পিতা-মাতার সান্ত্বনা-বাক্যেও মীরা প্রবোধ মানিলেন না, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রতন রাণা সন্ন্যাসীকে অনেক ধনরত্ন দিয়া তাঁহার কাছ হইতে ঐ বিগ্রহটি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী ধনলোভে তাঁহার ইষ্টদেবতাকে কাছ-ছাড়া করিতে স্বীকৃত হইলেন না এবং মেড়তা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মীরা নিরাশ হইয়া নিরশনে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

সেই রাত্রে সন্ন্যাসী স্বপ্ন দেখিলেন যে, গিরিধারীলাল যেন তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন "আমায় মীরার হাতে সমর্পণ কর"। সন্ন্যাসী তখন ফিরিয়া গিয়া মীরাকে বিগ্রহটি দান করেন। মীরা আজীবন প্রেম ভক্তি দিয়া এই মূর্ত্তিকেই পূজা করিয়া-ছিলেন। সন্ন্যাসী যে ফিরিয়া আসিয়া মীরাকে বিগ্রহটি দান করিলেন তাহা গিরিধারীলালের স্বপ্নাদেশে, না রাণার স্বীকৃত

অর্থের লোভে, না বালিকার একান্ত আগ্রহে স্নেহার্দ্র হইয়া, তাহা এখন এতদিন পরে নির্ণয় করা কঠিন।

মীরার বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপ গুণ ও সঙ্গীত-শক্তির খ্যাতি দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দূর দূরান্তরের লোকেরাও সেই খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া মীরাকে দর্শন ও তাঁহার গান শুনিয়া চরিতার্থ হইবার জন্য মীরার পিত্রালয়ে আসিতে লাগিল। মেড়তা মাড়োয়ারের একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইল। মীরার পিতা অতিথিপরায়ণ ছিলেন, তিনি অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা ও আতিথ্যসৎকারের ত্রুটি করিতেন না।

এই সময়ে চিতোরের রাণা মোকলদেবের পুত্র যুবরাজ কুম্ভকর্ণ বা কুম্ভ, কাহারো কাহারো মতে ইনি প্রসিদ্ধ রাণা সংগ্রামসিংহের কনিষ্ঠপুত্র কুমারভোজ বা ভোজ ; মীরার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হন এবং ছদ্মবেশে মীরার গৃহে যান। মীরাকে দেখিয়া এবং মীরার গান শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং তিনি তাঁহার ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া নিজপরিচয় দিয়া মীরাকে পত্নীরূপে পাইবার প্রার্থনা জানান। মীরার পিতা অতিথির পরিচয় পাইয়া সানন্দেই তাঁহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী বিহঙ্গী স্বর্ণপিঞ্জরে বন্দিনী হইলেন!

মীরার শ্বশুর-কুল শৈব। জনপ্রবাদ আছে যে, মীরা শ্বশুর-বাড়ীতে আনীত হইলে তাঁহাকে কুলদেবতা শিবকে প্রণাম

করিতে বলা হয়। তখন তিনি সেই অনুরোধ পালনে অস্বীকৃতা হইয়া বলেন যে—এক গিরিধারীলাল ছাড়া আর কাহাকেও আমি প্রণাম করি না। সেই দিন হইতে মীরার শ্বশুরবাড়ীতে লাঞ্ছনা-ভোগ আরম্ভ হয়। ভগবান লাঞ্ছনা দিয়াই ভক্তের ভক্তির পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

মীরা স্বামীগৃহে আসিয়া রাণীগিরির কৃত্রিম জীবনে কোনও আনন্দ পাইলেন না। চারিদিকে কেবল নিষেধের বেড়া—এমন গলা ছাড়িয়া গান গাওয়া রাণীর সাজে না! এমন যখন-তখন গান গাওয়া কুলবধূর উপযুক্ত নয়, ইত্যাদি। মীরা ইহাতে ম্রিয়মানা হইয়া পড়িলেন।

রাণা রাণীর বিষণ্ণতা দেখিয়া ক্ষুন্ন হইয়া কারণ জানিতে চাহিলেন। মীরা বলিলেন—রাজপ্রাসাদ আমার কারাগার হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আমি আনন্দ পাই না; কেবল যখন প্রভুর পদতলে বসিবার অবসর পাই, তখন সব দুঃখ দূর হইয়া যায়।

মীরার এই প্রভু যে কে, রাণা তাহা ভাবিয়া দেখিলেন না। তিনি মনে করিলেন, মীরা পতিভক্তি প্রকাশ করিয়া স্বামীসঙ্গ-সুখের কথাই বলিতেছেন। কিন্তু মীরা পরে বারম্বার স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যে—মীরা-কে প্রভু গিরধর নাগর!

রাণা মীরার কথা শুনিয়া সুখী হইলেন। তিনি কবি ছিলেন; তাই তিনি মীরাকেও কবিতা রচনা করিতে শিখাইতে

লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন—কবিতার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মীরা হয়ত বন্দীজীবনের দুঃখ অনুভব করিবার অবসর পাইবেন না।

মীরা শীঘ্রই কবিত্ব-শক্তিতে শিক্ষাগুরু স্বামীকে পরাভূত করিলেন এবং গিরিধারীলালকে সম্বোধন করিয়া অজস্র কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন।

মীরা হরিসংকীর্ত্তনে মত্ত থাকাতে তাঁহার স্বামীসেবায় ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। রাণা রুষ্ট হইলেন। মীরা বৈষ্ণব পাইলে তাঁহার সঙ্গেই কালযাপন করেন, ইহাতে মীরার স্বামী মীরার চরিত্রের বিশুদ্ধিতা সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। রাণা পুনরায় বিবাহ করিবেন বলিয়া মীরাকে ভয়ও দেখাইলেন।

মীরা কৃতাঞ্জলি হইয়া কাতর-বিনীত বচনে বলিলেন—মহারাণা, আপনি বিবাহ কর্‌লে আমি অত্যন্ত সুখী হব। আমি আপনার চরণ-সেবা যথোচিত কর্‌তে পার্‌ছি না—মীরা-মন হরি-মন ভয়ো রে—মীরার মন হরিময় হ'য়ে গেছে, সে আর মানবের দিকে ফির্‌বে না। অতএব আপনি আর-একটি দাসী নিয়ে আসুন।

এই উক্তিতে মীরার প্রতি রাণার সন্দেহ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। এই সন্দেহের আগুনে বাতাস দিতে লাগিলেন মীরার ননদ শ্রীমতী উদাবাঈ। রাণা ভগিনীকে অনুরোধ করিলেন, মীরার মতি-পরিবর্ত্তন ও চরিত্র সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিতে। উদা চম্পা-চামেলী নামে দুইজন চতুরা দাসীকে মীরার পাহারায়

নিযুক্ত করিলেন। চম্পা-চামেলী মীরাকে হরিভজন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে মীরা বলিলেন—হে সখী, আমি যে হরি বিনা রইতে পারি না। আমার শ্বাশুড়ী কোঁদল করেন, ননদ খিচ্‌খিচ্‌ করেন, রাণা রাগ করিয়া থাকেন, তাহারা পাহারাও রাখে, চৌকী বসায়, তালাও লাগান। কিন্তু আমার এ যে জন্মজন্মান্তরের পুরাতন প্রীতি, তাকে কি ছাড়া যায়? গিরিধারী নাগরই মীরার প্রভু, অন্য কাউকে তো আমার ভালো লাগে না!

মীরার সংসর্গে আসিয়া ক্রমশঃ চম্পা-চামেলীও মীরার হরিভজনের সহচরী হইয়া পড়িল।

চম্পা-চামেলীর পরাভব ও বিফলতায় ক্রুদ্ধ হইয়া উদা মহা আড়ম্বরে স্বয়ং মীরাকে বুঝাইতে আসিলেন। উদা বলিলেন—ওগো ভাভী (ভ্রাতৃবধূ), তোমার বিসদৃশ ব্যবহারে কুলে যে কলঙ্ক লাগ্‌ছে ; নগর যে তোমার নিন্দাবাদে মুখর হ'য়ে উঠেছে।

উদা লোভ দেখাইলেন ; বিলাসে ব্যসনে জীবন যাপনের সুখচিত্র আঁকিয়া মীরাকে শুনাইতে লাগিলেন। বলিলেন—তুমি রাণী, রাণীর উপযুক্ত বেশ-বাস ধারণ করো, ত্যক্ত আভরণ অঙ্গে তুলে সুন্দর বরতনু ভূষিত করো, মুক্তার হার পরো।

মীরা উত্তর করিলেন—শীল ও সন্তোষই আমার ভূষণ, আর কোনও অলঙ্কারের তো আমার আবশ্যক নেই। তোমার রাণাকে আমি আর মানি না, আমি গিরিধারীকে বর-রূপে পেয়েছি। আমি পরম ধনীর শরণ নিয়েছি, তাঁর নামের স্মরণ-

মালা হাতে ধারণ করেছি। যে যোগ পেয়েছে তার আর চিত্ত-চাঞ্চল্য কোথায়? আমি শ্রেষ্ঠ গুরু লাভ ক'রেছি। সাধুসঙ্গেই আমার মন সন্তুষ্ট। আমি আত্মীয়-কুটুম্ব থেকে পৃথক হয়েছি। আমাকে কোটিবার বুঝালেও আমি নিজের বুদ্ধি অনুসারে চল্‌ব। রত্নমণ্ডিত মুকুট যাঁর মাথায়, কণ্ঠে যাঁর মহামূল্য হার, যাঁর চরণে সর্ব্বদা ঘুঙুর বাজ্‌ছে, সেই শ্যামের সঙ্গে আমি পরিণীতা। লজ্জা শরম সব ত্যাগ ক'রে এই দেহ আমি তাঁর চরণের আধার করেছি। মীরার প্রভু গিরিধারী নাগর, সংসারের লোক যা পারে করুক আর সংসার চুলায় যাক।

মীরার এই বাক্য শুনিয়া উদাবাঈ নিরস্ত হইলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া রহিলেন এবং সুযোগ পাইলেই মীরার উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ভগিনীর প্ররোচনায় রাণার মনও মীরার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি শেষ পর্য্যন্ত মীরাকে চিতোর হইতে নির্ব্বাসন দিলেন।

মীরার পক্ষে রাজাদেশ শাপে বর হইল। তিনি আনন্দিত মনে গান করিতে করিতে চিতোর ত্যাগ করিয়া চলিলেন।

মীরা দাসী জনম-জনম-কী
অংগসু অংগ লগাবো,
মম চিত্তসু চিত্ত লগাবো॥

মীরা যে জন্ম-জন্মান্তরের দাসী তোমার। আমার অঙ্গে তোমার অঙ্গ স্পর্শ করাও, আমার চিত্তের সঙ্গে তোমার চিত্ত মিলিত করাও।

মীরাকে নির্ব্বাসিত করিয়া চিতোর নগর শ্রীহীন, রাজভবন নিরানন্দ হইল—মীরার মধুর কণ্ঠ সেখানে নীরব। কিছুদিনের মধ্যেই রাণা নিজের ভুল বুঝিয়া মীরাকে ফিরাইয়া আনিতে দূত পাঠাইলেন।

অভিমান-শূন্যা বৈষ্ণবী মীরা হরির বিরহে কাতর হইয়া গান গাহিয়া গাহিয়া পথে পথে চলিয়াছিলেন—

প্যারে, দরসণ দীজ্যো আয়,
তুম বিন রহ্যো ন জায়।
জল বিন কবঁল, চংদ বিন রজনী,
ঐসে তুম দেখ্যা বিন সজনী।
ব্যাকুল-ব্যাকুল ফিরূঁ রৈন দিন,
বিরহ কলেজা খায়॥
দিবস ন ভুখ, নীঁদ নহি রৈনা,
মুখ-সূঁ কথত ন আবৈ বৈনা,
কহা কহূঁ, কুছ কহত ন আবৈ,
মিল-কর্ তপত বুঝায়।
কেঁওঁ তরসাবো অংতরজামী,
আয় মিলো কিরপা কর্ স্বামী,
মীরা-দাসী জনম-জনম-কী
পড়ী তুম্হারে পায়॥

হে প্রিয়, এসে দর্শন দাও, তোমা বিনা যে থাকা যায় না। জল বিনা কমল ও চাঁদ বিনা রজনী যেমন, তেমনই তোমার দর্শন

বিনা আমি, হে প্রিয়। আমি আকুল-ব্যাকুল হ'য়ে রাত্রি-দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি। বিরহ আমার হৃদয় ভেঙে ফেল্‌ছে। দিবসে আমার ক্ষুধা নেই, রাত্রিতে নিদ্রা নেই, বল্‌তে চাইলেও মুখ থেকে বচন নিঃসৃত হয় না। কি বল্‌ব, কিছু বলাও যে আস্‌ছে না, তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আমার সন্তাপ নির্ব্বাপিত করো। হে অন্তর্য্যামী, তুমি কেন ভয় দেখাচ্ছ? হে স্বামী, কৃপা ক'রে এসো আমার কাছে, মীরা যে জন্ম-জন্মান্তরের দাসী, তোমার পায়ে এসে পড়েছে।

মীরা গান গাহিয়া গাহিয়া যেখানেই যাইতেছিলেন, সেখানেই মুগ্ধ নরনারী তাঁহাকে ঘিরিয়া মেলা করিতেছিল, কাজেই রাজদূত মীরাকে সহজেই খুঁজিয়া পাইল।

দূতের মুখে রাজার আদেশ অবগত হইয়া মীরা বলিলেন— মহারাণা একদিকে আমার রাজা, অপরদিকে আমার স্বামী। আমি তাঁর দাসী, তাঁর আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

মীরা চিতোর-নগরের তোরণে উপনীত হইলে মহারাণা বাদ্য বাজাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে গেলেন। রাণা মীরার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মীরা স্বামীর পদতলে প্রণাম করিয়া বলিলেন—স্বামী, আমি আপনার পদাশ্রিতা দাসী। আমারই পদে পদে অপরাধ ঘট্‌ছে, আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন।

মীরার স্বামীর মৃত্যু হইলে তাঁর দেবর বিক্রমজিৎ মহারাণা হন। তিনি মীরার সাধুসেবাতে, ভক্ত-সঙ্গে কালযাপনে ও

সাধন-ভজনে বাধা দিতে লাগিলেন। ভাইয়ের সঙ্গে আবার যোগ দিলেন মীরার ননদ উদাবাঈ।

একদিন উদাবাঈ মীরাকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন—ভ্রাতৃবধূ মীরা, রাণা তোমার উপর কুপিত হয়েছেন, রত্নপাত্রে বিষ গুল্‌ছেন।

মীরা শুনিয়া উত্তর করিলেন—উদাবাঈ, রাণা বিষ গুল্‌ছেন তো গুল্‌তে দাও, আমি সুখ-দুঃখ সবই ভগবানের চরণামৃত মনে ক'রে পান করব্‌।

উদাবাঈ মীরাকে ভীত না হইতে দেখিয়া বলিলেন—ভাইবৌ মীরা, সে বিষ খাওয়া তো দূরের কথা, দেখ্‌লেই মানুষ ম'রে যায়, এ যে-সে বিষ নয়, এ যাকে বলে বাসুকী নাগের বিষ!

মীরা অবিচলিতভাবে উত্তর দিলেন—হে উদাবাঈ, আমার মাতা-পিতা তো আমার এই দেহ অমর ক'রে ধরণীতে প্রেরণ করেননি।

মীরাকে চরণামৃত বলিয়া সত্যসত্যই বিষ দেওয়া হইল। মীরা জানিয়া শুনিয়াও হরির চরণামৃত নাম লইয়া আগত বিষ-পাত্রকে প্রত্যাখান করিতে পারিলেন না; তিনি বিষ পান করিলেন। তাহার ফলে তাঁহার ভগবৎ-প্রেমের নেশা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল।

মীরার সম্বন্ধে এইরূপ অলৌকিক কিম্বদন্তী অনেক আছে। মহারাণা হরির নির্ম্মাল্য বলিয়া ফুল দিয়া ঢাকিয়া কালসর্প

পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু মীরা সেই ফুল তুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে একটি শালগ্রাম ও ফুলের মালা রহিয়াছে। আরও শোনা যায় যে, মীরার প্রতি অত্যাচার করার ফলে মীরার ইষ্ট-দেবতা গিরিধারীলাল একদিন নৃসিংহ মূর্ত্তিতে মহারাণার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া মহারাণাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন।

ভক্তমাল গ্রন্থে আরও কতকগুলি কাহিনী আছে, যাহা ঐতিহাসিক বিচারে টিকে না। কিন্তু কিম্বদন্তীগুলি শ্রুতি-সুখকর বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভক্তমালে আছে—

এবম্ একদিনে দিল্লীশ্বরো স্বয়ংপ্রভুঃ।
শ্রুত্বা মীরাযশো দ্রষ্টুং তেন সৈন্যেন সংগতঃ॥

এইরূপে একদিন সম্রাট্ দিল্লীশ্বর মীরার যশ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য সৈন্য সহ সমাগত হইয়াছিলেন।

এই দিল্লীশ্বর কে? কিম্বদন্তী যে সম্রাট্ আক্‌বর নাকি সঙ্গীতাচার্য্য তানসেনকে সঙ্গে করিয়া যোগীবেশে মীরার কাছে আসিয়াছিলেন। বাংলা ভক্তমালে আছে—

মীরার সে গানশক্তি আকবর সাহা।
পাতসা শুনিতে মনে করিলা উৎসাহা॥
তানসেন সঙ্গে করি' বৈষ্ণবের বেশে।
মীরা বাঈর গৃহে গেলা হইয়া উল্লাসে॥
ঠাকুরের আগে মীরা গাইতে লাগিলা।
গান শুনি তানসেন আপনা নিন্দিলা॥

মীরার এত খ্যাতি, এত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও মীরার উপর রাণা ও উদাবাঈয়ের অত্যাচারের মাত্রা কিছুমাত্র কমে নাই। তাঁহারা মীরাকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন।

মীরা আঘাত সহ্য করিবার জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করিতে চাহিলেও রাণার প্রতিবন্ধকতায় তাঁহার হরিভজনে নিরন্তর ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। তখন তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া, পরম ভক্ত তুলসীদাস গোস্বামীকে পত্র লিখিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই পত্রের উত্তরে গোঁসাই তুলসীদাস লিখিলেন—

জাকে প্রিয় ন রাম বৈদেহী।
তজিয়ে তাহি কোটি বৈরী সম, যদ্যপি পরম সনেহী॥
তজ্যো পিতা প্রহ্লাদ, বিভীষণ বন্ধু, ভরত মহ্‌তারী।
বলি গুরু তজ্যো, কন্ত ব্রজবনিতা, ভয়ে সব মঙ্গলকারী॥
নাতো নেহ রাম সেঁা মনিয়ত, সুহৃদ্ সুসেব্য জহাঁ লৌ।
অঞ্জন কহা আঁখ জো ফুটে, বহুতক কহোঁ কহাঁ লৌ॥
তুলসী সো সব ভাঁতি পরম হিত, পূজ্য প্রাণ তেঁ প্যারো।
জা সেঁা হোয় সনেহ রামপদ, এতো মতো হমারো॥

রাম-সীতা যাহার প্রিয় নয়, সে যদ্যপি স্নেহাপাত্রও হয়, তবু তাহাকে কোটি বৈরী সম জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করিবে। প্রহ্লাদ পিতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, বিভীষণ বন্ধুকে, ভরত মাতাকে, বলিরাজা গুরুকে, আর ব্রজাঙ্গনারা স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের এই ত্যাগ সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গলকর হইয়াছিল। রামের

সঙ্গে সম্বন্ধ যাহার যত বেশী, সে সেই পরিমাণে সুহৃৎ ও সেবার যোগ্য। সে অঞ্জনে কি প্রয়োজন, যার প্রয়োগে চক্ষু অন্ধ হয়? এ বিষয়ে আমি আর কত বলিব? তুলসী বলিতেছেন, সেই ব্যক্তিকেই পরম হিতকারী পূজ্য ও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মনে করিবে, যাহার সঙ্গ করিলে রামপদে প্রেম জন্মে। এই আমার অভিমত।

গোঁসাই তুলসীদাসের এই উপদেশ পাইয়া মীরা আত্মীয়-স্বজন ও চিতোর ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন।

হরিবিরহবিধুরা মীরার বিরহ-ব্যথা-প্রকাশক গানগুলি কবিত্বে ও ভাবে মনোরম। প্রকৃতি-রাজ্যের সকল সুন্দর সামগ্রী মীরার মনে সেই পরমসুন্দরের স্মৃতি জাগাইয়া তুলে, আর মীরা কাতর হইয়া সেই পরমসুন্দর হরির সহিত মিলনের জন্য পাগল হন।

বর্ষা আসিয়াছে। বর্ষাগমে মীরার অন্তরে অহরহ হরির কথাই জাগিয়াছে। হরি-মিলনের ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া তিনি গিহিয়াছেন—

মতবারো বাদল আয়ো রে,
হরি-কো সঁদেসা কুছ নহিঁ লায়ো রে।
দাদুর মোর পপীহা বোলে,
কোয়ল সব্দ সুনায়ো রে॥
কারী আঁধিয়ারী বিজলী চমকে,
বিরহন অতি ডর পায়ো রে॥

গাজে বাজে, পবন মধুরিয়া,
মেহা অতি ঝড় লাগো রে।
ফুঁকে কালী-নাগ বিরহ-কী-জালী।
মীরা মন হরি ভাবো রে॥

মাতাল বাদল আসিয়াছে, কিন্তু সে তো হরির সংবাদ কিছুই লইয়া আসিল না। দর্দুর ময়ূর পাপিয়া ডাকিতেছে, কোকিল গান শুনাইতেছে, কালো অন্ধকারে বিজলী চমকাইতেছে, বিরহিণী অতিশয় ভয় পাইতেছে, বজ্র গর্জন করিতেছে, মধুরিয়া বাতাস বহিতেছে, মেঘ অতি বর্ষণ আনিয়াছে। কালীয় নাগ বিরহজ্বালা ফুৎকার দিতেছে। আজ এই বাদল-দিনে মীরার মনে হরি ভাবিত হইতেছেন।

শ্রাবণের বর্ষণ সঙ্গীত মীরার নিকট গভীর অর্থভরা। উহা তাহার কানে হরির আগমন-বার্তা ঘোষণা করিয়াছে। তাই তিনি শ্রাবণের বর্ষণ-সঙ্গীত শুনিয়া উন্মনা হইয়াছেন হরির দর্শন-লাভের নিমিত্ত।—

বরসে বদরিয়া সাবন-কী।
সাবন-কী মন ভাবন-কী।
সাবন-মেঁ উমগ্যো মেরো মনবা
ভনক সুনী হরি-আবন-কী॥
উমড় ঘুমড় চহুঁ দিস্-সে আয়ো,
দামিন দমকে ঝর লাবন কী।

নন্‌হী নন্‌হী বুঁদন মেহা বরসে,
শীতল পবন সোহাবন-কী।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর,
আনন্দ-মংগল গাবন-কী॥

শ্রাবণের বাদল বর্ষণ করিতেছে, শ্রাবণের না মনভাবনের বর্ষণ হইতেছে। শ্রাবণে আমার মন উন্মনা হইয়া উঠিয়াছে হরির আগমনের ধ্বনি শুনিয়া। গুরুগম্ভীর মেঘ চারি দিক হইতে ঘিরিয়া আসিতেছে, দামিনী লাবণ্যের ধারা বিচ্ছুরিত করিতেছে, মেঘ হইতে গুঁড়ি গুঁড়ি বারিবিন্দু বর্ষিত হইতেছে, শীতল পবন স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া যাইতেছে। মীরার প্রভু গিরিধারী নাগর আনন্দ-মঙ্গল গান করিয়া শোনাইতেছেন।

মীরার ভগবৎ-প্রেমের মধ্যে একটি দাস্য-মিশ্র মধুর ভাব আছে। সেই ভাবটি অতি মনোরম। একটি প্রসিদ্ধ গানে মীরার ঐ দাস্যভাবটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত শ্যামলিমার মধ্যে মীরা ভগবৎ-সত্তা অনুভব করিয়া বলিয়াছেন—

ম্‌হাঁনে চাকর রাখো জী,
সাবঁরিয়া ম্‌হানে চাকর রাখো জী॥
চাকর রহসূঁ বাগ লগাসূঁ, নিত উঠি দরসন পাসূঁ,
বৃন্দাবন-কী-কুঞ্জ গলিন্‌মেঁ তেরী লীলা গাসূঁ॥
হরে হরে সব বন বনাউঁ বিচ বিচ রাখূঁ বারী।
সাবঁলিয়াকে দরসন পাউঁ পহির কুসম্মী সারী॥
জোগী আয়ো জোগ করন-কূঁ, তপ করনে সন্ন্যাসী।
হরি-ভজন-কূঁ সাধু আয়ো বৃন্দাবনকে বাসী॥

চাকরী-মেঁ দরসন পাউঁ, সুমিরণ পাউঁ খরচী।
ভাব ভগতি জাগীরী পাউঁ, তিনো বাতা সরসী॥
মীরাকো প্রভু গহির গম্ভীরা, হৃদয় রহো জী ধীরা।
আধী রাত প্রভু দরসন দীন্হে প্রেম-নদী-কী তীরা॥

(আমায়) চাকর রাখো গো!
(ওগো শ্যামল) আমায় চাকর রাখো গো!
চাকর হ'য়ে রইব
তোমার বাগান লাগাব,
আর ঘুম ভেঙে রোজ দেখবো আমি
তোমার সকাল বেলা।
(আমায়) চাকর রাখো গো!
তোমার বাগে
গন্ধ ফুলের গাছ লাগাবো
লাল সাদা আর নীলা,
বৃন্দাবনের কুঞ্জপথে
গাইবো তোমার লীলা।
(আমায়) চাকর রাখো গো!
সবুজ শোভার বন সাজাবো,—
জল ভরা ঝিল্-মাঝে,
শ্যামলে শ্যাম দেখবো তোমায়
সকল ফুলের সাজে।
(আমায়) চাকর রাখো গো!

যোগী এলেন যোগের লোভে
সন্ন্যাসী তপ লাগি,
ভক্ত এলেন বৃন্দাবনে
ভজন-অনুরাগী !
(কিন্তু) মীরার প্রভু স্বভাব-গোপন
থির হ রে মন—ধীরে
(প্রভু) আধেক রাতে দেবেন দেখা
নীল যমুনার তীরে।
(প্রভু) আঁধার রাতে কবেন কথা
নীল যমুনার তীরে।

প্রকৃতির শ্যামলতার মধ্যে মীরা হরিকে দেখিতে পান, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহার আহ্বান শুনিতে পান—

নয়ন ললচায়ত জিয়রা উদাসী।
শাবঁল বনমেঁ বাজে শাবঁল-কী বাঁশী॥
রৈনা-মেঁ শয়না-মেঁ মোরা নয়না ন লাগে,
মোরা নঁীদ ন লাগে—
পীতম-কে শোঁয়াস আবে কুসুম-সুবাসী॥

আমার নয়ন হয় লালায়িত, আর জীবন হয় উদাসী যখন শুনি শ্যামল বনে বাজে শ্যামলতার বাঁশী। রজনীতে শয্যায় আমার নয়ন মুদ্রিত হয় না, আমার নিদ্রা আসে না, আমার কাছে যে সেই প্রিয়তম হরির কুসুম-সুবাসিত নিঃশ্বাস আসে।

মীরা বৃন্দাবনে সাধুভক্তগণের সঙ্গ লাভ করিয়া আপনার

সহজ সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। মহাযোগী রৈদাসজীর নিকটে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। নরসীনামক এক সাধু-পুরুষের নিকটও তিনি ধর্ম্মোপদেশ লাভ করেন। এই সাধুর জীবন-চরিত মীরা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার নাম 'নরসীজীকী মায়রা'।

মীরা একদিন সাধু সন্দর্শন করিতে করিতে রূপ বা জীব গোস্বামীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু রূপ গোস্বামী মীরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন—

গোসাঞি কহেন, মুই করি বনে বাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ॥
এই কথা শুনিয়া বাঈ ক্ষোভ পাই মনে।
পুন কহি পাঠাইল গোসাঞির স্থানে॥

মীরা বলিয়া পাঠাইলেন—

নিত নহানে-সে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই।
ফলমূল খা-কে হরি মিলে তো বান্দর বাঁদরাই॥
তীরণ ভখন-সে হরি মিলে তো বহুত মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো বহুত হৈ খোজা॥
দুধ পিকে হরি মিলে তো বহুত বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম-সে ন মিলে নন্দলালা॥

নিত্য স্নান করিলে যদি হরি মিলিত ত জলজন্তু হইতাম। ফলমূল খাইয়াই হরি মিলিলে বাঁদরগণ হরিকে পাইত। তৃণ

ভক্ষণ করিলে যদি হরি মিলিত, তবে বহু মৃগী আর ছাগী হরিলাভ করিত। স্ত্রী ছাড়িয়া হরি পাইলে বহু খোজাই ত আছে (তাহারাই হরিকে পাইত)। দুধ পান করিলেই হরি লাভ করা গেলে বহু বাছুর ত আছে (তাহারাও হরিকে লাভ করিত)। মীরা বলেন, বিনা ভালবাসায় হরিকে পাওয়া যায় না। গোস্বামী মীরার কথায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন ও লজ্জিত হইয়া মীরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

কিম্বদন্তী আছে, মীরাবাঈ একবার দ্বারকায় রণছোড়জীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার দেহ সেই বিগ্রহে বিলীন হইয়া যায়।

বর্ত্তমানে মীরাবাঈর ভক্তগণ একটি বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন এবং তাঁহার ভজনগুলি রাগগোবিন্দ নামে সংগ্রহ করিয়াছেন। মীরাবাঈর গানগুলি রাজপুত বৈষ্ণব সমাজে খুব ভক্তির সহিত গীত হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলের স্ত্রী সাধিকা মাত্রেই এখন মীরাবাঈ নামে নিজেদের পরিচয় দেন। মীরার গান আর তাঁহার সর্ব্বসংস্কারমুক্ত ভজনসমূহ চিরকাল সকল দেশের ভক্তি ও কাব্য-রস-পিপাসুদের কাছে সমাদরের সামগ্রী হইয়া থাকিবে।

শ্রীচৈতন্য

ধর্ম্মজগতে বিচিত্র এক লীলা দেখা যায় যে, যখনই কোনো দেশে ধর্ম্মের গ্লানি হয়, তখনই কোনো এক অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মসংস্কার করেন। বাংলায়ও এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন এদেশের সামাজিক ও ধর্ম্ম-জীবনের অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল শোচনীয়। লোকে উচ্চতর ধর্ম্মের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, বেদার্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভক্তিশূন্য কর্ম্মকাণ্ডে দেশ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। লোকে ভগবানের কথা ভুলিয়াও ভাবিত না, লোকেদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেমভক্তির নামগন্ধও ছিল না। সে যুগের লোকেরা কেবল ঘটা করিয়া চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি লৌকিক দেবতাগণের পূজা করিত আর ঐ সকল পূজায় অনুষ্ঠান এবং আড়ম্বরটাই হইয়া উঠিয়াছিল প্রধান। ভগবানের প্রতি সত্যকারের ভক্তির বিশেষ অভাব হইয়াছিল। এ সময়ে চৈতন্যভাগবতে তাৎকালিক সমাজের একটি সুন্দর চিত্র দেখা যায়।

> যে সময়ে না ছিল চৈতন্য অবতার।
> বিষ্ণুভক্তিশূন্য ছিল সকল সংসার॥

এবং তখন—

> ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
> মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥

দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাও যে পূজেন, সেহো মহাদম্ভ করি'॥
'ধন বংশ বাড়ুক', করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোনো জনে॥
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত।
ইহাই শুনিতে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥

বাংলাদেশ এমনি ভক্তিশূন্য হইয়া পড়িলে, ধর্ম্মের নামে বিবিধ অনাচারে দেশ শুষ্ক আড়ষ্ট হইয়া উঠিলে, আধ্যাত্মিক জড়তার শৈত্যে দেশ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইলে ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যদেব এদেশে আবির্ভূত হন। চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত আর চৈতন্যভাগবত—এই উভয় গ্রন্থেই আছে যে, 'প্রেমভক্তি শিখাইতে তিনি অবতীর্ণ' এবং 'ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার'। ভগবানের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য চৈতন্যদেব বাংলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতি ভক্ত-সাধকগণ দেশবাসীর হৃদয়ক্ষেত্র অল্প অল্প প্রস্তুত করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলেই একেশ্বরবাদতত্ত্ব প্রচার করিতেছিলেন, জাতিভেদের পাপ এদেশ হইতে দূর করিবার জন্য এবং এদেশের জনসমাজের মনকে উদার ও সর্ব্বসংস্কারমুক্ত করিবার জন্য তাঁহাদের মহামূল্য বাণী প্রচার করিতেছিলেন। বাংলাদেশেও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের

পূর্ব্ব হইতে ভক্তির বাতাস বহিয়াছিল। পতিত মানব-সমাজের উদ্ধারের জন্য কয়েকজন সাধক তখন বদ্ধপরিকর। শ্রীবাস, হরিদাস প্রভৃতি সাধুগণ তখন হইতেই শান্তিপুরের ভক্ত সাধক অদ্বৈত গোস্বামীকে কেন্দ্র করিয়া অল্পে অল্পে দেশে ভগবৎ-প্রেম প্রচার করিতেছিলেন। চতুর্দ্দিকে ধনাড়ম্বর, উপধর্ম্মের উপাসনা এবং অন্ধবিশ্বাসের প্রাধান্য দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের অন্তর ব্যথিত হইত এবং পতিত মানব-সমাজের উদ্ধার কামনায় ভগবানের নিকট তিনি প্রার্থনা করিতেন।

যখন দেশের এইরূপ অবস্থা তখন আচার্য্যের ক্ষুদ্র ভক্ত-মণ্ডলী নির্জ্জনে পরম প্রেমভরে ব্যাকুল অন্তরে ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। দুষ্ট লোকে যখন অদ্বৈতাচার্য্যের মণ্ডলীর স্বতন্ত্র উপাসনা পদ্ধতির সন্ধান পাইল, তখন উহারা তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ এমন কি অত্যাচার পর্য্যন্ত করিতে লাগিল। দুষ্ট লোকেরা অদ্বৈত আচার্য্যের আর তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীর ঘর-দুয়ার পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

দেশের এই মহা দুর্দ্দিনে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। এই জন্যই তাঁহাকে যুগাবতার বলা হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া আপনার অপ্রমেয় প্রেম ও ভক্তির বীজ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিতেই তাহা অচিরে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। পরম স্বাদু স্বাস্থ্যপ্রদ ফলের ফসল দেশ অক্লেশে লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক দুর্ভিক্ষের

করাল কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বসন্তের সমাগম সূচনায় যেমন আপনা-আপনি মলয় মারুত প্রবাহিত হয়, বনে বনে কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, গিরি শৈল অরণ্যে বৃক্ষলতা নবীন পত্র-মুকুলে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে, তৃণটি পর্য্যন্ত নবীন জীবন লাভ করিয়া নূতন শোভা দান করে, বনের সমস্ত কোকিল বসন্তের সাড়া পাইয়া আবাহন সঙ্গীত গাইয়া উঠে, তেমনি ভক্তিশূন্য এই দেশে চৈতন্যদেবের আগমন সূচনায় নানা ভক্তের আবির্ভাব হইতে লাগিল এবং দেশে ঈশ্বরভক্তি দেখা দিল!

রাধাকৃষ্ণভক্তিই চৈতন্যপ্রচারিত ধর্ম্মের প্রাণ। বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করা চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম ছিল বলিয়া তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের নাম ছিল বৈষ্ণব ধর্ম্ম। চৈতন্যদেব একদিন বাংলার সর্ব্বত্র পরম ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ফলে ভক্তিশূন্য এই দেশে ভক্তির বন্যা বহিয়াছিল। চৈতন্যদেবের কৃষ্ণভক্তি এমন নিবিড় ছিল যে, উহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার ভক্ত শিষ্যগণ ভক্তির মহিমা বুঝিয়াছিলেন। ইঁহার কৃষ্ণভক্তি এমনই ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের রূপের সঙ্গে যে সকল জিনিসের সামান্য সাদৃশ্যও আছে, তাহা দেখিয়া তিনি বিমোহিত হইয়াছেন। কালিন্দী বা যমুনার জল, ময়ূরের কণ্ঠ, তমাল তরু—এ সবই চৈতন্যদেবকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে তাঁহার আরাধ্য দেবতার কথা। সমুদ্রতরঙ্গ দেখিয়া তিনি তাহাকে যমুনা নদীর জলরাশি বলিয়া ভুল করিতেন। সেই নীল জলরাশি দেখিয়া তাঁহার মনে পড়িয়া যাইত তাঁহার আরাধ্য

দেবতার নীল-নবঘন অঙ্গকান্তির কথা। নদী দেখিবামাত্র উহা যমুনা বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইত।

যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
তাঁহা নাচে গায়, প্রেমাবেশে পড়ে কান্দি॥

—চৈতন্যচরিতামৃত

আবার ময়ূরের কণ্ঠের নীলিমা দেখিয়া তাঁহার মনে পড়িয়া যাইত সেই শ্রীকৃষ্ণের কথা, আর ভক্তির আবেগে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় লুটাইতেন।

ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণ স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা॥

—চৈতন্যচরিতামৃত

মেঘের নীলিমা আর তমাল-তরুও চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে করাইয়া দিয়াছে।

তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া।
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া।

—গোবিন্দদাসের কড়চা

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রীচৈতন্যদেব—'আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার'—তিনি নিজে কৃষ্ণভক্তি বা ভগবদ্‌ভক্তিতে তন্ময় হইয়া ঈশ্বরপ্রেমের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের জন্ম হয় ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্‌গুন মাসের পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়। চৈতন্যদেবের পিতার নাম ছিল জগন্নাথ মিশ্র। মাতার নাম শচীদেবী। ইহাদের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্টে।

কিন্তু জগন্নাথ বিদ্যাশিক্ষার জন্য শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন এবং সেখানেই সংসার পাতিয়া বসবাস করিতেছিলেন। সেকালে নবদ্বীপ বিদ্যাশিক্ষার স্থান হিসাবে খুব বিখ্যাত ছিল। তাই বাংলার নানা স্থান হইতে বিদ্যার্থীগণ সেখানে বিদ্যালাভের জন্য আসিতেন। জগন্নাথও আসিয়াছিলেন।

এই নবদ্বীপে চৈতন্যদেব ভূমিষ্ঠ হন। তবে চৈতন্যদেব ইহার আসল নাম ছিল না। ইহার আসল নাম ছিল বিশ্বম্ভর। ইহার আরও নাম ছিল—গোরাচাঁদ, গৌরাঙ্গ, নিমাই ইত্যাদি। ইহার বর্ণ ছিল গৌর, মনে হইত যেন শত চাঁদের সুবর্ণকান্তি দিয়া তাঁহার অঙ্গরাগ করা হইয়াছে। তাই ইনি গোরাচাঁদ, গৌরাঙ্গ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের একটি বড় ভাই ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ ছিলেন পিতামাতার স্নেহের দুলাল। ইনিও ছিলেন অতিশয় সুশ্রী, অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও মেধাবী। পড়াশুনায় ইহার অতীব অনুরাগ ছিল। এই বালক অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি পাঠ করিয়া মাত্র ষোল বৎসর বয়সেই সংস্কৃত-শাস্ত্রে ও দর্শনে সবিশেষ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে ইঁহার বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়া যায়। কিন্তু বিশ্বরূপ সংসারে আবদ্ধ হইতে চাহিলেন না। তিনি একদিন কাহাকেও না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বিশ্বরূপের অন্তর্ধানের পরে জগন্নাথ মিশ্রের ভয় হইল যে, ষোল বৎসর বয়সে বড় ছেলে যখন লেখাপড়া শেখার ফলেই সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেল, তখন চৈতন্যদেবও হয়ত লেখাপড়া শিখিয়া গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে। সুতরাং তিনি পাঁচ বৎসরের শিশু চৈতন্যদেবের পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—

এই যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হবে গুণবান্।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ করিবে পয়াণ॥
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই।
মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাঞি॥

—চৈতন্যভাগবত

কিন্তু লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দেওয়ায় বালক চৈতন্যদেব নানারকম দুষ্টামি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি গঙ্গার ধারে গিয়া পূজারত ব্রাহ্মণগণের উপরে বিশেষ উৎপীড়ন করিতেন। কেহ হয়ত জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা করিতেছেন, অমনি চৈতন্যদেব তাঁহাকে "ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণ ধরিয়া"। কোনো ব্রাহ্মণ হয়ত হাতে-গড়া মাটির শিবলিঙ্গ সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিতেছেন, এমন সময় বালক নিমাই গিয়া তাঁহাদের শিবলিঙ্গ আর কোশাকুশী লইয়া পলায়ন করিতেন। চোখ মেলিয়া শিবমূর্ত্তি আর কোশাকুশী না দেখিয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণদের চক্ষুস্থির হইয়া যাইত। কখনও বা তিনি কাহারও গায়ের চাদর টানিয়া লইয়া পলায়ন করিতেন, কাহারও পূজার ফুল ফেলিয়া

দিতেন। লোকেরা তাহাদের কাপড় চাদর গঙ্গার ধারে রাখিয়া স্নান করিতে জলে নামিলে এই দুরন্ত বালক অলক্ষ্যে আসিয়া স্নানার্থীদের কাপড় চাদর জলে ভিজাইয়া দিয়া পলাইয়া যাইতেন, কেহ টের পাইত না। কখনও বা আবার কাহারও কাপড়-চোপড় লুকাইয়া রাখিয়া পলায়ন করিতেন, লোকেরা স্নান করিয়া উঠিয়া তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি না পাইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইতেন। নিজেদের বাড়ীতে আর পাড়া-প্রতিবেশীর গৃহেও তাঁহার দুষ্টামির আর অন্ত ছিল না।

বালক নিমাইয়ের এইরূপ দুরন্তপণা দেখিয়া নবদ্বীপবাসীরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা জগন্নাথ মিশ্র আর শচীদেবীকে অনুরোধ-উপরোধ করিতে লাগিলেন নিমাইকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার জন্য। প্রতিবেশীদের কথায় জগন্নাথ মিশ্র বাধ্য হইয়া শেষ পর্য্যন্ত পুত্রকে টোলে পাঠাইলেন অধ্যয়ন করিতে।

বিষ্ণুদাস, সুদর্শন ও গঙ্গাদাস—এই তিনজন পণ্ডিতের টোলে চৈতন্যদেব অধ্যয়ন করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। নিজের শিক্ষা সমাপন করিয়া চৈতন্যদেব একটি টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র সতের বৎসর। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখনই দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নানা দেশ হইতে ছাত্রগণ আসিয়া তাঁহার টোলে সমবেত হইত বিদ্যাশিক্ষার জন্য।

এই সময়ে কেশব কাশ্মীরী নামে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিয়া সেখানকার পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। কেশব কাশ্মীরী অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি দেশ-বিদেশের অনেক বড় বড় পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে হারাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহার আগমনে, ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধির গৌরবের কথা শুনিয়া নবদ্বীপবাসীগণ ভীত হইলেন।

কিন্তু চৈতন্যদেব নবদ্বীপের মুখ রাখিলেন। ইনি ইতিপূর্ব্বেই অনেক বড় বড় পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে হারাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতেরা নিজেরা ইঁহার সহিত তর্ক করিতে ভরসা না পাইয়া ইঁহাকে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

চৈতন্যদেব তখন ভাগীরথীর তীরে বসিয়া তাঁহার শিষ্যগণের সহিত আলাপ-আলোচনায় রত ছিলেন। কেশব কাশ্মীরী সেখানে গিয়া চৈতন্যদেবের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং গঙ্গার শোভা বর্ণনা করিয়া সুন্দর সুন্দর কতকগুলি শ্লোক মুখে মুখে রচনা করিয়া চৈতন্যদেবকে বিস্মিত করিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব ঐ সকল শ্লোকের প্রত্যেকটির মধ্য হইতে অলঙ্কারের দোষ, ব্যাকরণের দোষ প্রভৃতি বাহির করিয়া কেশব কাশ্মীরীর সকল গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। নবদ্বীপের এই তরুণ যুবকের কাছে হার মানিয়া বিদ্যাভিমানী কেশব কাশ্মীরী লজ্জায় অধোবদন হইয়া সেখান হইতে অদৃশ্য হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই চৈতন্যদেবের পিতৃবিয়োগ হয়।

পিতার মৃত্যুর পরে ইনি একবার ইঁহার শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া বাংলার সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য শুধু দেশভ্রমণ নহে, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানবিতরণ। এই ভ্রমণ শেষ করিয়া যখন তিনি নবদ্বীপে ফিরিলেন তখন শুনিলেন যে, সাপের কামড়ে তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হইয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে আর একটি বালিকার সহিত চৈতন্যদেবের বিবাহ হইয়াছিল।

কিছুদিন চৈতন্যদেবের দিনগুলি বেশ আমোদে কাটিল। কিন্তু প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার চরিত্র ও মনের ভাব যেন বদলাইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে তিনি হাস্য-পরিহাসপ্রিয় ছিলেন, সদাচঞ্চল যুবক ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তিনি যেন কেমন গম্ভীর প্রকৃতির যুবকে পরিণত হইলেন।

এমনি সময়ে চৈতন্যদেব তাঁহার মাতার অনুমতি লইয়া পিতৃপিণ্ড দান করিবার নিমিত্ত গয়ায় গমন করিলেন। গয়ার পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল ঈশ্বরপুরী নামে এক মহা-ভক্তের। ঈশ্বরপুরীর ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া চৈতন্যদেবের মনে ভক্তির উদয় হইল—ধর্ম্মভাবে তাঁহার অন্তর এই সময়ে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে চৈতন্যদেব ধর্ম্মের কথা লইয়া হাস্যপরিহাস করিতেন। ঈশ্বরপুরীরই ঈশ্বরভক্তি-মূলক শ্লোকগুলি হইতে কতদিন কত ভুল তিনি বাহির করিয়াছিলেন। কিন্তু এবারে ঈশ্বরপুরীর ভক্তির আবেগ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া চৈতন্যদেবের মতিগতি ফিরিয়া গেল। তিনি ঈশ্বরপুরীর শিষ্য

হইলেন। ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে তিনি কৃষ্ণভক্তি শিখিলেন, কৃষ্ণভক্তিতে তাঁহার মন-প্রাণ ভরিয়া উঠিল। তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু তীর্থগমনের পূর্ব্বেকার চৈতন্যদেব আর তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরবর্ত্তী চৈতন্যদেব যেন পৃথক ব্যক্তি। পূর্ব্বে তিনি অতিশয় পরিহাসপ্রিয় ছিলেন। হাস্য করিয়া, রঙ্গ করিয়া, অধ্যাপনা করিয়া তাঁহার দিন কাটিত। কিন্তু গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তিনি সর্ব্বদা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। তিনি—

কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ।
নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা আর ভক্তিতে তিনি পাগলের মত হইলেন। ভগবানের কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি সব ভুলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিলেই তিনি অশ্রুপাত করেন। মাঝে মাঝে ভাবাবেশে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করেন—তখন আর তাঁহার বাহিরের জ্ঞান থাকে না। মনে ভাবেন ভগবানের সহিত তিনি এক হইয়া গিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের এমনি পরিবর্ত্তন দেখিয়া, নবদ্বীপের সকলেই অবাক হইয়া গেল। তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার নিকট টোলে পড়িতে গেলে তিনি আর তাহাদিগকে পড়ান না—কেবল ভগবানের গুণগান করেন। গুরুদেবের এই ভাব দেখিয়া কোনো ছাত্র টোল ছাড়িল, কেহ বা তখনও তাঁহার শিষ্য থাকিয়া তাঁহার

সহিত হরিনাম কীর্ত্তনে যোগ দিল। তাঁহার টোল উঠিয়া গেল। এখন হইতে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করাই তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় সাধনা হইয়া উঠিল। এই সময়ে ভগবদ্-ভক্তিতে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণের নাম করিয়া ক্রন্দন করিতেন, কখনও বা ঘরের কোণায় বসিয়া আবেগভরে চোখের জল ফেলিতেন, শত ডাকেও কোনো উত্তর দিতেন না। মাঝে মাঝে তিনি তাঁহার প্রিয়সুহৃৎ গদাধর দাসকে সম্মুখে পাইয়া বলিতেন—"আমি দেখিয়াছি! কি দেখিয়াছি শুনিবে?" গদাধর সাগ্রহে শুনিতে চাহিতেন। চৈতন্যদেবও বলিতে যাইতেন—কিন্তু ভাবাবেগে তাঁহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইত না। তিনি আনন্দাশ্রু মোচন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেন। সকলে তখন তাঁহার পরিচর্য্যা করিত। বহুক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞান হইত। মূর্চ্ছাভঙ্গের পরেও তাঁহার সেই উন্মাদনার হ্রাস হইত না।

চৈতন্যদেবের এই যে ভাবান্তর, ইহা হইয়াছিল তাঁহার ঈশ্বরোপলব্ধির ফলে। তিনি যেন তাঁহার দিব্যচক্ষুতে তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে সর্ব্বদা সম্মুখে দেখিতে পাইতেন। এমন কি তিনি উপলব্ধি করিতেন যে, তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতার সহিত এক হইয়া গিয়াছেন। তাই আনন্দে তিনি আত্মহারা হইতেন, তাঁহার আনন্দের কথা প্রকাশ করিতে গিয়া আনন্দাতি-শয্যে মূর্চ্ছিত হইতেন। কিন্তু লোকে তাহা বুঝিত না। সকলে ভাবিত যে, নিমাই পাগল হইয়াছেন। শচীদেবী প্রমাদ

গণিয়া কবিরাজ ডাকিলেন। কবিরাজ আসিয়া শিবাদি ঘৃতের ব্যবস্থা দিয়া গেলেন। শচীদেবী নবদ্বীপের প্রবীণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীবাসকে একদিন ডাকিয়া পাঠাইয়া তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন। শ্রীবাস নিভৃতে গৃহমধ্যে চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ঘণ্টা দুই পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া শচীদেবীকে বলিলেন—তোমরা কাহাকে পাগল বলিতেছ! নিমাই বায়ুগ্রস্ত হয় নাই। কৃষ্ণভক্তিতে তন্ময় হইয়াছেন বলিয়া তাহার এমনি আচরণ।

অতঃপর শ্রীবাসের আঙ্গিনাতেই প্রতিদিন সঙ্কীর্ত্তন হইত। চৈতন্যদেব প্রতিদিন সেখানে যাইতেন এবং হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। দেশ বিদেশ হইতে ঈশ্বরভক্তগণ সেখানে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। সকলে মিলিয়া ভগবানের নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন—সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইতেন। এক একদিন দিবারাত্র সেখানে খোল করতাল বাজিত, সেই বাদ্যে আর মধুর হরিনামে নবদ্বীপের আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিত। গান গাহিতে গাহিতে চৈতন্যদেব-শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেন। নৃত্য করিতে করিতে কোথা দিয়া যে এক একদিন সমস্ত রাত কাটিয়া যাইত তাহা তাঁহারা বুঝিতেও পারিতেন না।

নবদ্বীপের একদল লোক চৈতন্যদেবের এই হরিগুণগানকে বিষম উপদ্রব বলিয়া মনে করিলেন। দলে দলে লোক চৈতন্যদেবের শিষ্য হইতেছিল বলিয়া নবদ্বীপের একদল

লোক প্রমাদ গণিল। তাহারা কাজীর কাছে নালিশ করিল। কাজী কীর্ত্তন বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন।

কিন্তু চৈতন্যদেব সে নিষেধ শুনিলেন না। একদিন শত শত কীর্ত্তনীয়া সঙ্গে লইয়া তিনি পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন। শত শত মৃদঙ্গ, শত শত করতাল বাজিতে লাগিল। ভাবোন্মত্ত চৈতন্যদেব আর তাঁহার পার্শ্বদগণ হরিনাম গাহিতে গাহিতে পথ দিয়া চলিলেন। কাজী তখন চৈতন্যদেবের অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া, আর তাঁহার গভীর ঈশ্বরভক্তি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। তিনি আর কোনো বাধা দিলেন না। চৈতন্যদেব আর তাঁহার ভক্তেরা তখন হইতে বিনা বাধায় ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপে হরিনাম করিয়া চৈতন্যদেব নদীয়াকে মাতাইয়া তুলিলেন। তারপরে ভাবিলেন যে, শুধু নবদ্বীপের মধ্যে এই হরিনাম প্রচার করিলে ত চলিবে না। এই নাম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে হইবে। এই জন্য তিনি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

নবদ্বীপ হইতে চৈতন্যদেব কাটোয়ায় গমন করেন। সেখানে কেশব ভারতী নামে এক সন্ন্যাসীর নিকটে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পরে তাঁহার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে চৈতন্যদেব প্রায় সমস্ত দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণ করেন। যেখানে তিনি যাইতেন, সেখানেই তিনি কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিতেন। তাঁহার ঈশ্বরপ্রেম

এমনই ছিল যে, কোনোরূপ বক্তৃতাদ্বারা উহা তাঁহাকে জনসমাজে প্রচার করিতে হয় নাই। তাঁহার আবেগ দেখিয়া শত শত ভক্ত আসিয়া আপনা আপনিই তাঁহার অনুচর হইত। তখন সকলে মিলিয়া হরিগুণ-গান করিতে করিতে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতেন। ফুলের সুরভি আর চন্দ্রকিরণের মাধুর্য্য যেমন কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না, তেমনি চৈতন্যদেবকেও তাঁহার ভক্তির মর্ম্ম কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তির আবেগ আর ঈশ্বরপ্রেমের আকৃতি দেখিয়া সকলেই ভাবিত কৃষ্ণনামে না জানি কত মধু আছে, সেই পরমপুরুষ ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিলে না জানি কি আনন্দলোকে পৌঁছানো যায়! এই ভাবিয়া সকলে দলে দলে চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত।

সত্যই তাঁহার নিজের আচরণে ভগবানের সহিত মিলনের আনন্দ যেভাবে অভিব্যক্ত হইত, তাহার ফলেই শত শত লোক ঈশ্বরভক্ত হইয়াছিল, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ প্রেম ও দীনতা। এই প্রেম ও দীনতা শ্রীচৈতন্য তাঁহার নিজের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ভক্তগণকে বলিতেছেন—

তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি কারু পায়ে ধরে সেই ঠাঁই ॥
নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারু, করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি কারো দেন ত আপনে ॥

কুশা গঙ্গা মৃত্তিকা দেন কারো করে ।
সাজি বাহি কোন দিন চলে কারো ঘরে ॥

শ্রীচৈতন্যদেব এই দীনতা ও সেবার ভাব লইয়া ভক্ত অদ্বৈতার্য্যের বৈষ্ণব মণ্ডলীতে যোগ দিয়াছিলেন। ইহাতে প্রচ্ছন্ন সঙ্কুচিত বৈষ্ণবগণ চৈতন্যদেবের মহাভাবে প্রাণে বল পাইলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যে মহা ঘটা করিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেরণায় নবদ্বীপের বৈষ্ণবমণ্ডলী সকল বাধা, সকল নিষেধ তুচ্ছ করিয়া সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের বিজয় অভিযান করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব কখনো আপনাকে অবতার বলিয়া প্রচার করেন নাই। যদি কেহ কখনও তাঁহাকে সেরূপ বলিয়াছে, তিনি তাহাকে বাধা দিয়া ভৎ র্সনা করিয়াছেন। একদিন কৃষ্ণনাম ছাড়িয়া চৈতন্যের নামে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে চৈতন্য বলিয়াছিলেন—

শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন।
"কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তন" ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলার ধর্ম্মজগতে সে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাব আমাদের দেশের জাতিভেদের ও অস্পৃশ্যতার সংস্কারের মূলে দারুণ আঘাত হানিয়াছিল। এই ছুঁৎমার্গপন্থী দেশের বুকে জন্মগ্রহণ করিয়া একদিন তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন ভাগবতের সেই বাণী—চণ্ডালোঽপি দ্বিজঃশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ। তিনি নিজে আচণ্ডাল সকলকে প্রেমভক্তি বিলাইয়া যান।

তাঁহার—

নিরন্তর নৃত্যগীত কীর্ত্তন-বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিল প্রকাশ॥

সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর কত লোককে এবং কত নীচ পতিতকে যে তিনি অকপটে তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তিনিই প্রথম আমাদের এই বাংলা দেশে আচণ্ডাল জনসাধারণকে ধর্ম্মের অধিকার দিয়া নিম্নস্তরের লোককেও মানুষ হইবার সুবিধা দিয়াছিলেন। জাতিভেদের বন্ধন তাঁহার প্রেমের আঘাতে টুটিয়া গিয়াছিল—তাঁহার আবির্ভাবে দেশের পরম কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। মানুষের সহিত মানুষের যে একটি নিগূঢ় আত্মীয়তার সম্বন্ধ আছে, তাহা চৈতন্যদেব আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে—

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধজন।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥

হিন্দু-মুসলমান, উচ্চ-নীচ সকলকেই চৈতন্যদেব ভালবাসিয়াছিলেন। তাই হিন্দু-মুসলমান উচ্চ-নীচ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার শিষ্য হইত।

মুসলমান হরিদাস শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সদ্‌-ব্রাহ্মণের প্রাপ্য শ্রাদ্ধের ভোজ্য-পাত্র

পর্য্যন্ত পাইবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন। হরিদাসের মৃত্যুর পরে তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া চৈতন্যদেব উন্মত্তের মত নৃত্য করিয়াছিলেন এবং সমস্ত ভক্তকে তাঁহার পদধূলি লইতে বলিয়াছিলেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ-শাসিত নবদ্বীপের মধ্যে ইহা অল্প সাহসের কথা নহে।

চৈতন্যদেবের বিশ্বাস ছিল যে, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমাজের তথাকথিত উচ্চ নীচ সকলেরই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-প্রকাশে সমান অধিকার। তাই দেখি যখন তিনি তাঁহার প্রধান পার্ষদ ও শিষ্য নিত্যানন্দ প্রভুকে নীলাচল হইতে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নবদ্বীপে প্রেরণ করিতেছেন, তখন তিনি বলিতেছেন—

প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি আছি নিজমুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে॥

এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন॥

অতঃপর—

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র সেইক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে, লই নিজগণে॥

চৈতন্যদেব বলিতেন—

প্রভু বোলে, যে জন ডোমের অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়॥
মুচি যদি ভক্তি সহ, ডাকে কৃষ্ণ ধনে।
কোটি নমস্কার করি তাহার চরণে॥

মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণ পর্য্যন্ত চৈতন্যদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন। হরিদাসের কথা আমরা বলিয়াছি। এতদ্ভিন্ন বুদ্ধিমন্ত খান নামে এক ব্যক্তিও চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিঁহো সেবক প্রধান॥
—চৈতন্যচরিতামৃত

চৈতন্যভাগবতে আছে—

বুদ্ধিমন্ত খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য কথন॥

নীলাচলে রথযাত্রার সময়ে যখন চৈতন্যদেবের ভক্তগোষ্ঠী গমন করিলেন, তখনও—

চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য আজ্ঞা যাঁহার বিষয়॥

চৈতন্যদেবের জীবন ছিল বড় সুন্দর। তাঁহার বাণীগুলিও বড় সুন্দর। ইহজগতে সার ধর্ম্ম কি সে সম্বন্ধে তিনি তাঁহার

প্রিয় শিষ্য সনাতনকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—

জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন।
এই তিন সার ধর্ম্ম শুন সনাতন॥

জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁহার যে বাণী, তাহা অতুলনীয়। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—মানুষ মানুষের ভাই। সেখানে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা আসিবে কেন!

জাতি কুল ধন ও ক্রিয়া এ সকল কিছুই নহে। প্রেম না থাকিলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না।

অস্পৃশ্য বলিয়া কিছু বা কেহ নাই। মানুষের মধ্যে উচ্চ নীচ নাই। মানুষমাত্রেই ঈশ্বরের অংশ।

তাঁহার অপরাপর বাণীও সমাজের কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্য্য।

ক্রোধ দমন মহতের প্রকৃত লক্ষণ। পাপীকে আলিঙ্গন করিতে পারার মধ্যেই হৃদয়ের মহানুভবতা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পৃথিবীর ধন মান পদগৌরব ইত্যাদি ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীতে যতদিন বাস করিবে ততদিন ভক্তি, সেবা, ধর্ম্মপরায়ণতা ও শিক্ষার দ্বারা জীবনকে মাণিক্যের ন্যায় উজ্জ্বল রাখিবে।

ভক্তি ও বিশ্বাস দুর্ল্লভ বস্তু। কোটি কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পৃথিবীতে আছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজনও জ্ঞানী আছেন কি না সন্দেহ। জ্ঞানীগণের মধ্যে আবার ভক্তের সংখ্যা অনেক কম। যাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, তিনিই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারেন। ভক্তিই মুক্তির পথ।

মানুষ শান্তি শান্তি করিয়া পাগল হয়। কিন্তু সে জানে না

যে তাহার অন্তরের মধ্যেই শান্তি রহিয়াছে। যেখানে সংযম, যেখানে ত্যাগ, যেখানে ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, সেখানেই শান্তি বাস করে।

চৈতন্যদেবের অন্যতম বাণী—দীনতা অবলম্বন করিবে, সহিষ্ণু হইবে।—

তৃণ হইতে নীচ হঞা সদা লইবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।
ভৎর্সনা তাড়নে কারে কিছু না বলিব॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয়॥

চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীগুলি যেমন, তাঁহার ভগবৎ প্রেমের প্রগাঢ়তা ও তন্ময়তাও তেমনি অনির্ব্বচনীয়। তাঁহাকে সর্ব্বদা পাহারা দিয়া রাখিতে হইত। নতুবা তিনি কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া যেখানে-সেখানে ছুটিয়া যাইতেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইতেন। পুরীতে জগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শনকালে একটি রমণী ভিড়ে মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দেবদর্শনে ব্যাকুল হইয়া চৈতন্যদেবের কাঁধের উপরে এক পা আর গরুড়ের মাথার উপর এক পা রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের পার্শ্বদ-গণ ইহাতে ঐ রমণীকে ভৎর্সনা করিলে তিনি বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন,—ঐ রমণীর মত ব্যাকুল আগ্রহ তাঁহার কই হইয়াছে, যাহাতে বাহ্যজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়!

ইহা ভক্তের আত্মগ্লানি মাত্র। বস্তুতঃ ভগবৎ-ভক্তিতে চৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান খুব অল্প সময়েই থাকিত।

চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবসান, সেও এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় কাহিনী। সেও এক মধুর কবিত্বময় ঘটনা। সমুদ্র-বেলায় ভ্রমণ করিতে করিতে মাথার উপরে নীল অনন্ত আকাশ, সম্মুখে অনন্ত নীল সিন্ধু তাঁহাকে কৃষ্ণরূপ স্মরণ করাইয়া দিল। তিনি ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণকে বুকে ধরিবার জন্য ঝাঁপাইয়া সমুদ্রে পড়িলেন—তাঁহার উপবাসজীর্ণ শীর্ণ দেহ ছাড়িয়া তাঁহার মহাপ্রাণ অনন্ত প্রেমাস্পদের অমৃত-সদনে চলিয়া গেল।

রামপ্রসাদ

মধ্যযুগের একেবারে শেষভাগে বাংলাদেশে একজন সাধক আবির্ভূত হন। তাঁহার নাম রামপ্রসাদ সেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাধক এবং কবি। এই সাধক-কবির গান শোনেন নাই এমন বাঙ্গালী নাই বলিলেই চলে।

রামপ্রসাদ কালীভক্ত ছিলেন। তিনি কালীর সাধনা করিতেন, আর মুখে মুখে শ্যামা-মায়ের বন্দনা করিয়া গান রচনা করিতেন। এই সকল গানে সাধক-কবি রামপ্রসাদ কালীকে স্নেহময়ী মাতার মত করিয়া দেখিয়াছেন। আর কবি শিশুর মত কখনও তাঁহার সহিত পরিহাস করিয়াছেন, কলহ করিয়াছেন—কখনও আব্দারে ছেলের মত মায়ের কাছে তাঁহার প্রার্থনা জানাইয়াছেন, স্নেহের দাবী জানাইতেছেন; কখনও মায়ের সহিত অভিমান করিতেছেন—মাকে গালি দিতেছেন। এই গালি কপট—উহা স্নেহ ভক্তি ও আত্মসমর্পণের কথায় পরিপূর্ণ। রামপ্রসাদের গানে শ্যামা মায়ের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও নির্ভরশীলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

তাঁহার গানগুলি ভক্তির প্রস্রবণ। কিন্তু সেগুলিতে ভাষার কারীগরী নাই, অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি কবির অহেতুক অনুরাগ নাই। সেগুলিতে কবির প্রাণের অন্তস্তল হইতে ভক্তি উৎসারিত হইয়া অপরূপ সরলতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই সাধক-কবিটি সব সময়েই কালীর ভাবে মোহিত হইয়া থাকিতেন।

তাঁহার ইষ্টদেবতার সহিত সর্ব্বদাই যেন তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত। দেবীর সহিত ভক্তের সেই সরল কথোপকথন তাঁহার গানের বিষয়।

ভারতের যে সকল সাধকের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে যেমন সাম্প্রদায়িকতার অভাব ও উদার সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—সাধক-কবি রামপ্রসাদও সেইরূপ উদারহৃদয় ভক্ত ছিলেন। তাঁহার অন্তর যে সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতার বিরোধী ছিল, সে পরিচয় তিনি তাঁহার গানে রাখিয়া গিয়াছেন।

রামপ্রসাদ সেন চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট বা হালিশহর গ্রামে এক বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহের নাম ছিল রামেশ্বর সেন। পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদ সেনের পিতা পিতামহ সকলেই শক্তির উপাসক ছিলেন, কবিও নিজে শক্তির উপাসক ছিলেন।

রামপ্রসাদ বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি এক সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতেও পাঠ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সংস্কৃতে গভীর জ্ঞানলাভ করেন এবং মৌলবীর নিকট ফার্সি শিক্ষা করিয়া ফার্সিতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তি ও ঈশ্বরভক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ষোল বৎসর বয়স হইতেই ইনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করেন—কালী-ভক্তিই তাঁহার কবিত্বশক্তি উৎসারিত করিয়াছিল।

শ্যামা-মায়ের বন্দনার্থে রামপ্রসাদের অন্তর হইতে সঙ্গীত স্বতঃই উৎসারিত হইত। ঐ গান গাহিয়া তিনি বড় আনন্দে আত্মভোলা হইয়া কালযাপন করিতেন। বিষয়কর্ম্মে তাঁহার মন যাইত না। কিন্তু অকস্মাৎ কবির পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে। ইহাতে বিষয়নিস্পৃহ কবিকে ভীষণ অসুবিধায় পড়িতে হইল। তিনি অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন এবং বহু চেষ্টার পর কলিকাতার এক ধনবানের গৃহে তিনি হিসাব-রক্ষকের একটি কাজ জুটাইয়া লইলেন। তখন হইতে আপন-ভোলা এই সাধক-কবিকে সংসার প্রতিপালনের জন্য হিসাব রক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিতে হইল। বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

কিন্তু রামপ্রসাদ তাঁহার আরাধ্য দেবতা কালীর কথা ভুলিলেন না। হিসাবের খাতার মধ্যে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ-রূপে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে পারিলেন না। হিসাব কষিতে কষিতে হিসাবের পাকা খাতার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তিনি প্রায়ই ভক্তির আবেগে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া গান রচনা করিয়া বসিতেন।

কবি ধনীর তহবিলদারী ও মুহুরীগিরি করিতেন। কিন্তু তাহা ভুলিয়া নিজেকে কালীর তহবিলদার ভাবিয়া একদিন লিখিয়া বসিলেন—

আমায় দে মা তবিলদারী
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী!—ইত্যাদি

এমনি অনেক গানে তাঁহার হিসাবের খাতাখানি ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন ঐ হিসাবের খাতা গিয়া পড়িল রামপ্রসাদের উপরিতন এক কর্ম্মচারীর হাতে। তিনি খাতার অষ্টে-পৃষ্ঠে গান রচনা করা রহিয়াছে দেখিয়া চটিয়া গেলেন এবং প্রভুর কাছে হিসাবের খাতাখানি লইয়া গিয়া রামপ্রসাদের কাণ্ডকারখানা দেখাইলেন। কর্ম্মচারীটি কিছু স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনিব রামপ্রসাদের গানগুলি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। হিসাবের খাতার পাতায় পাতায় গান রচনা করা রহিয়াছে দেখিয়া রাগিয়া উঠা ত দূরের কথা—রামপ্রসাদের মনিব ঐ সকল গানে রামপ্রসাদের সুগভীর ঈশ্বরভক্তি আর তাঁহার কবিত্বশক্তির বিকাশ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি বুঝিলেন যে, রামপ্রসাদ কেবল উদরান্ন সংস্থানের জন্য এই মুহুরীগিরির কাজ লইয়াছেন। তিনি যেরূপ ধর্ম্মপ্রাণ এবং কবিতা রচনায় তাঁহার যেরূপ শক্তি তাহাতে সুযোগ পাইলে তিনি বঙ্গবাণীর মন্দিরে অচিরকালের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পূজারী-রূপে আসন পাইবেন ইহা নিঃসন্দেহ। ইহা বুঝিয়া তিনি মনে মনে রামপ্রসাদকে মাসিক ত্রিশ টাকা মাসহারা দিতে অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন—"বাপু! তুমি এই সংসারের কাজ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই। তুমি জগজ্জননীর কাছে যে 'তবিলদারী' চাহিয়াছ, তাহা তুমি সময় হইলেই পাইবে। এখন তুমি নিজের গৃহে যাইয়া সাধনা কর। তুমি আমার দপ্তরখানার খাতা নষ্ট

কর নাই। বরং তোমার ভক্তির আবেগে উৎসারিত কবিতার দ্বারা আমার খাতা পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে—আমার খাতা অলঙ্কৃত হইয়াছে। আমার দফ্তরে বংশাবলীক্রমে ঐ খাতা থাকিবে ও তোমার ভগবদ্ভক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এখন তুমি গৃহে যাও, সেখানে বসিয়া তুমি আমার সংসার হইতে মাসে মাসে ৩০৲ টাকা পাইবে।"

অতঃপর রামপ্রসাদ কুমারহট্টে ফিরিয়া গেলেন এবং সংসারের ভারমুক্ত হইয়া কালীর সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এখন হইতে সঙ্গীত ও কাব্যরচনা করিয়া কবির সময় কাটিতে লাগিল। তাহার আজীবনের সাধ পূর্ণ হইল। গ্রামে ফিরিয়া তাঁহার সঙ্গীত-কুসুমরাশি অফুরন্তভাবে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল—সেই সঙ্গীতের মাধুর্য্যে সমস্ত দেশ মুগ্ধ হইল।

যখনকার কথা বলিতেছি, সেই সময়ে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি কবি ও জ্ঞানী গুণীর সমাদর করিতে জানিতেন। তাঁহারই রাজসভায় কবিবর ভারতচন্দ্র সমাদৃত হইয়াছিলেন। এই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে কুমারহট্টে আসিতেন। তিনি রামপ্রসাদের গুণগান শুনিয়া একদিন এই সাধক কবিকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার ভগবদ্ভক্তিমূলক গান শুনিয়া এমন মোহিত হইলেন যে, তিনি তাঁহাকে নিজের রাজসভায় লইয়া যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিষয়-নিস্পৃহ কবি মহারাজের সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। যাহা হউক, রামপ্রসাদের অপরূপ

গান শুনিয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে কবিরঞ্জন উপাধি দান করিয়াছিলেন এবং একশত বিঘা নিষ্কর জমি উপহার দিয়াছিলেন। এই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ রামপ্রসাদ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর ও কালীকীর্ত্তন নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদের যশ কাব্যরচনার জন্য নহে। তাঁহার যশ সঙ্গীত রচনার জন্য।

যে কোনও ব্যক্তি রামপ্রসাদের গান শুনিয়াছেন, তিনিই তাঁহার গানের মধুরতায় ও ঐকান্তিক ভাবের আবেগে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার কলিকাতাবাসী ধনী মনিবের কথা বলিয়াছি, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা বলিয়াছি। উভয়েই কবির সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাও একবার এই রামপ্রদাদের গান শুনিয়া নৌকা থামাইয়া কবিকে সাদরে আহ্বান করিয়া কবির গান শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা একদিন গঙ্গাবক্ষ দিয়া নৌকাযোগে কুমারহট্টের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। রামপ্রসাদ তখন গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন, আর আপন মনে শ্যামাসঙ্গীত গাহিতেছিলেন। সেই অমৃতবর্ষী সুরলহরী, ঐকান্তিক ভক্তিমূলক গান নবাবের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ নৌকা থামাইয়া কবিকে নৌকায় আহ্বান করিয়া গান গাহিতে বলিলেন। রামপ্রসাদ নবাব বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রথমে উর্দ্দু গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে গান শুনিয়া

নবাবের তৃপ্তি হইল না। যিনি একবার রামপ্রসাদী শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়াছেন, অন্য কোনো প্রকার সঙ্গীত কি তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে? তাই নবাব রামপ্রসাদকে থামাইয়া বলিলেন, "আপনি জলে দাঁড়াইয়া যে সঙ্গীত গাহিতেছিলেন উহা গাহিয়া আমায় শুনান।" কবি তখন তাঁহার নিজের দেওয়া সুরে স্বরচিত শ্যামাসঙ্গীত গাহিলেন। ঐ গানের সুর নবাবের মন-প্রাণকে আলোড়িত করিয়া তুলিল, তাঁহার কর্ণে যেন অমৃতধারা বর্ষিত হইল। তিনি মুগ্ধ হইয়া রামপ্রসাদকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন।

রামপ্রসাদ প্রথম জীবন হইতেই ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তাঁহার জীবন ছিল ভক্তিময়। যখনই তাঁহার মনে ভক্তির উচ্ছ্বাস হইত, তখনই তিনি তাহা সঙ্গীতে ব্যক্ত করিতেন। গীত রচনায় তাঁহার কালাকাল স্থান-অস্থান জ্ঞান ছিল না। প্রায় সর্ব্বদাই তিনি আপন মনে মুখে মুখেই গান রচনা করিয়া গুন গুন রবে সেগুলি গাহিতে থাকিতেন। আজীবন তিনি যে মানস চক্ষুতে তাঁহার আরাধ্যা দেবীকে দর্শন করিতেন এবং সেই সাক্ষাৎকারের ফলে তাঁহার অন্তরে যে অপার আনন্দ খেলিয়া যাইত, তাহার কথা তাঁহার গানেই রহিয়াছে।

জগন্মাতা যে তাঁহাকে সশরীরে দেখা দিয়াছিলেন সে অতি-প্রাকৃত কাহিনীও প্রচলিত আছে। শুনা যায় একদিন তিনি তাঁহার ঘরের বেড়া বাঁধিতেছিলেন। ঐ সময় তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরীকে বেড়ার

অপরদিকে গিয়া বেড়ার ছিদ্রপথে দড়ি ফিরাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। জগদীশ্বরী কিছুক্ষণ দড়ি ফিরাইয়া দিয়া গৃহকাজে সে স্থান হইতে চলিয়া যান। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাতে বেড়ার দড়ি ফিরানর কাজে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই। বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে তাঁহার কন্যারই মত কে একজন শেষ পর্য্যন্ত দড়ি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে, তাহার কন্যা সেই স্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতা, তোমার বেড়া বাঁধা হইয়া গিয়াছে ?" উত্তরে রামপ্রসাদ বলিলেন, "হাঁ"। তখন জগদীশ্বরী আবার বলিলেন, "কিন্তু দড়ি ফিরাইয়া দিল কে ?" রামপ্রসাদ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন, তুমিই ত দড়ি ফিরাইতেছিলে !" রামপ্রসাদের কথা শুনিয়া জগদীশ্বরী বলিলেন, "না বাবা, আমি ত খানিকক্ষণের জন্য স্থানান্তরে গিয়াছিলাম। আমি ত বেড়ার ওধারে থাকিয়া দড়ি ফিরাইয়া দিই নাই।" ইহাতে রামপ্রসাদের বিস্ময় আরও বাড়িল। তিনি ভাবিলেন, "তবে কি স্বয়ং 'জগদীশ্বরী' আসিয়া এতক্ষণ আমার বেড়া বাঁধায় সহায়তা করিতেছিলেন !" স্বয়ং জগজ্জননী তাঁহাকে দেখা দিয়া গিয়াছেন, এই আনন্দে তিনি তখন গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

মন কেন মা'র চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া॥

জগজ্জননীকে চিনিতে পারেন নাই—সেজন্য একটু আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া আরও গাহিলেন—

সময় থাক্‌তে না দেখ্‌লে মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে,
বাঁধেন আসি' ঘরের বেড়া॥

যেই ধ্যানে একমনে,
সেই পাবে কালিকা তারা।
বার হ'যে দেখ কন্যারূপে,
রামপ্রসাদের বাঁধ্‌ছে বেড়া॥

রামপ্রসাদের গানে উদার আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জাঁকজমকের সহিত পূজা করার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আড়ম্বরের সহিত পূজা করিলে অন্তরে অহঙ্কারের উদয় হয়। ঐ অহঙ্কার ভক্তিপথের অন্তরায়। এরূপ পূজায় জগন্মাতার করুণা লাভ করা যায় না। তাঁহার মতে ভক্তির সহিত জাঁকজমকবিহীন পূজাই যথার্থ পূজা। জাঁকজমক থাক আর নাই থাক, ভক্তি থাকিলেই মায়ের করুণা লাভ সম্ভব—ভক্তির সহিত পূজাতেই মায়ের পূজা সার্থক। রামপ্রসাদ মূর্ত্তি-পূজারও অসারতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

মন তোর এত ভাবনা কেনে?
একবার কালী বলে বস্‌রে ধ্যানে!

জাঁকজমকে কর্‌লে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে কর্‌বে পূজা, জান্‌বে না রে জগজ্জনে॥
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি', বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥
আলো চাল আর পাকা কলা, কাজ কি রে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্ত কর আপন মনে॥
ঝাড়-লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর সে রোসনাইয়ে।
তুমি মনোময় মানিক্য জ্বেলে, দাও না জলুস নিশি দিনে॥
মেষ ছাগল মহিষাদি, কাজ কি রে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী ব'লে, দেও বলি ষড়-রিপুগণে॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল কাজ কি রে তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী জয় কালী বলি' দেও করতালি,
মন রাখো সেই শ্রীচরণে॥

দেবীপূজায় আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। ভক্তির সহিত গোপনে ভগবানের আরাধনা করিলেও সে পূজা দেবতার নিকট পৌঁছায়—সে পূজায় দেবতা সন্তুষ্ট হন। পূজায় মূর্ত্তির প্রয়োজন নাই, আলোচাল আর ফলমূলের নৈবেদ্যেরও প্রয়োজন নাই—পূজার প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন ভক্তির। পূজায় ঝাড়-লণ্ঠনের রোসনাইয়ের কি প্রয়োজন আছে? পূজায় মেষ মহিষ ছাগ বলিদান না দিয়া—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য এই ষড়রিপুর বলিদান আবশ্যক। পূজায় ঢাক ঢোল না বাজাইয়া জগন্মাতার প্রতি আত্মনিবেদন ও একান্ত নির্ভরশীলতা অধিকতর প্রয়োজন!

রামপ্রসাদ নিজে যদিও বিগ্রহ পূজা করিতেন, তথাপি তাঁহার অন্তরে বারংবার জাগিয়া উঠিয়াছে সেই অনন্ত বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরীর কথা। বিশ্বের সকল সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে তিনি তাঁহার আরাধ্যা দেবী-মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না ?
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না !
ওরে ত্রিভুবন সে মায়ের মূর্ত্তি ,
জেনেও কি তাই জান না !
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটির মূর্ত্তি,
গড়িয়ে করিস্ উপাসনা ?

জগজ্জননীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া মানুষ তাঁহাকে ডাকের সাজ পরাইয়া পূজা করে। ইহা যে কত নিরর্থক, তাহা উপলব্ধি করিয়া কবি গাহিয়াছেন—

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা,
দিয়ে কত রত্ন সোনা,
ওরে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা !

আমরা এই বিশ্বজগতের পালনকর্ত্রী অন্নদাত্রীকে আলোচাল প্রভৃতির নৈবেদ্য দান করি। কিন্তু রামপ্রসাদ ইহার অসারতা উপলব্ধি করিয়া গাহিয়া গিয়াছেন—

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা ;
ওরে, কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়,
আলোচাল আর বুটভিজানা॥

জগৎকে পালিছেন যে মা,
পশুপক্ষী, কীট, নানা ;
ওরে, কেমনে দিতে চাস্ বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা ॥

কবি যেমন মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতির অসারতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি তীর্থ-ভ্রমণের অসারতাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি গাহিয়া গিয়াছেন—'কি কাজ রে মন যেয়ে কাশী'—'নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র হেঁটে'। তিনি বলেন ভক্তির সহিত শ্যামা-মায়ের চরণ-বন্দনা করিলেই তীর্থভ্রমণের পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে—

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥
হৃদকমলে ধ্যানকালে, আনন্দ-সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥
কেলে মার চরণ কাশী,
সেই কাল চরণ ভালবাসি।
কাশী ম'লে হয় মুক্তি,
এ বটে শিবের উক্তি ;
ওরে, সকলের মূল ভক্তি
মুক্তি হয় তার দাসী ॥

অন্যত্র—

কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী,
যার হৃদে জাগে এলোকেশী,

তার কাজ কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম
ও তার মর্ম্ম যে বা জানে ॥

রামপ্রসাদ শ্যামা-সঙ্গীতের আদিকবি। তিনি অতুলনীয় আগমনী-গানেরও আদি কবি। রামপ্রসাদের পূর্ব্বে আর কেহ আগমনী গান রচনা করেন নাই। আগমনী গানগুলিতে উমাকে অবলম্বন করিয়া বাৎসল্য-রসের ধারা উৎসারিত হইয়াছে। কবি উমাকে কন্যাস্নেহে ভালবাসিয়া এই আগমনী গানসমূহ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী দেবী দুর্গাকে কেবল ভক্তি করিয়া তৃপ্ত হয় নাই। তাহারা উমাকে কন্যাস্নেহে ভালবাসিয়াছে। বাঙ্গালীর সেই অনুভূতি রামপ্রসাদের আগমনী-গানে অভিব্যক্ত। উমার প্রতি বাঙ্গালীর অন্তরের পুঞ্জীভূত স্নেহ-মমতা রামপ্রসাদের গানে ভাষা পাইয়াছে। পিত্রালয়ে উমার অবস্থানে বাঙ্গালীর অন্তরে যে বিচ্ছেদব্যথা গুমরিয়া উঠে, আর পিত্রালয়ে আগমন উপলক্ষে বাঙ্গলার নরনারী আবালবৃদ্ধ-বণিতার হৃদয়ে যে আনন্দলহরী খেলিয়া যায়,—সেই বিচ্ছেদব্যথা ও আনন্দোচ্ছ্বাস রামপ্রসাদের আগমনী গানের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

রামপ্রসাদ আজীবন জগজ্জননী শ্যামা-মায়ের ভাবে ভাবিত হইয়া কাটাইতেন। তাঁহার ভক্তি ছিল ঐকান্তিক, মায়ের প্রতি তাঁহার ছিল অসীম নির্ভর। তাই আজীবন তিনি সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই বড় আনন্দে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোধান—তাহাও পরম রমণীয়। শুনা যায় যে, তিনি নাকি

গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে গাহিতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছে বটে। কিন্তু মরিয়াও তিনি অমর। বাঙ্গালী তাঁহাকে বিস্মৃত হয় নাই—হইবেও না। এখনও হালিশহরে এই সাধক কবির স্মৃতিপূজা হইয়া থাকে। তাঁহার গান আজিও বাংলার হাটে মাঠে বাটে গীত হইয়া থাকে—তাঁহার গানগুলি বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। বাঙ্গালী তাঁহার গানে মুগ্ধ—গানের জন্য বাঙ্গালী তাহার কণ্ঠে যশোমাল্য পরাইয়া দিয়াছে। কারণ, বাঙ্গালী দেখিয়াছে যে, তাঁহার গানের মধ্য দিয়া সমগ্র বাংলাদেশের নরনারীর অন্তরের স্নেহ প্রীতি ও ভক্তির কথা প্রকাশ পাইয়াছে। রামপ্রসাদী শ্যামা-সঙ্গীতে ও আগমনী গানে বাঙ্গালীরই অনুভূতি অভিব্যক্ত।

সম্পূর্ণ